৩৯

ISSN 1605-2021
লোক-প্রশাসন সাময়িকী
উনচত্বারিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৬/জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

লোক প্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোক-প্রশাসন সাময়িকী

উনচত্বারিংশত্তম সংখ্যা, জুন ২০০৬/জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আশরাফ হোসেন

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

মোঃ মাহামুদ-উল-হক

কঙ্কা জামিল

মোঃ শফিকুল হক

মোঃ কায়েসুজ্জামান

সম্পাদক

মোঃ সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া

লোক-প্রশাসন সাময়িকী

(বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক জার্নাল)

ঊনচত্বারিংশত্তম সংখ্যা, জুন ২০০৬/জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

প্রকৃত প্রকাশকাল : জুলাই ২০০৯/ শ্রাবণ ১৪১৬

সম্পাদক : মোঃ সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া

টেলিফোন	:	৭৭১০০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স	:	৭৭১০০২৯
সম্পাদকের ই-মেইল	:	sanwarsamia@gmail.com
ওয়েব সাইট	:	http:/www.bpatc.org.bd
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	:	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	:	নারায়ন সরকার
মূল্য	:	১৮০ টাকা
		US $ 10

মুদ্রণ : তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩

LOK PROSHASON SAMOEEKY

(Quarterly Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre)

Vol. 39, June 2006/Jaisthya 1413

Actual Time of Publication : July 2009/Srabon 1416

Editor : Md. Sanwar Jahan Bhuiyan

Telephone	:	7710010-16 (PABX)
Fax	:	7710029
Editor's e-mail	:	sanwarsamia@gmail.com
Website	:	http:/www.bpatc.org.bd
BPATC Library	:	351.0005
Price	:	Tk. 180
		US $ 10

লোক-প্রশাসন সাময়িকীর প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

বাংলাদেশের ইকোপার্ক উন্নয়ন: প্রতিবেশবাদী পরিপ্রেক্ষিত ১
এ.এস.এম. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া

Concept of Human Resource Information System (HRIS) Structure, Uses and Limitations ২৩
Md. Sanwar Jahan Bhuiyan

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন ও সম্পদ আহরণ ৪৩
ড. এস, জে, আনোয়ার জাহিদ

The Practice of Dowry in Bangladesh: A Study on Existing Situation and Reasons for Sudden Bloom up ৫৫
Nadira Sultana
Mohammad Sajjad Hossain Bhuiyan

The RMG Sector - An Investigation into the Tripartite MoU for Betterment of the Sector & Its Workforce ৭৩
Shyamal Kanti Ghosh

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক: একটি পর্যালোচনা ৯১
অদুদ রায়হান

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
উনচত্বারিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৬/জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

বাংলাদেশের ইকোপার্ক উন্নয়ন: প্রতিবেশবাদী পরিপ্রেক্ষিত

(Development of Ecopark in Bangladesh: An Ecological Perspective)

এ.এস.এম. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*

Abstract: *The concept of ecopark is of recent origin. The aim of establishing ecopark is twofold: firstly, providing a recreational opportunity is for the visitors and secondly, fostering importance of biodiversity and an overall awareness about the mother-earth. In Bangladesh most of the creation of ecopark is a blatant threat on livelihood of the tribal people. For ages, tribal people have been living and working forests and they have been drawing their sustenance from the environment. But the prevailing practice of establishment of ecopark by the government has failed to take care of the symbiotic lifestyle of the tribal people living in their forest areas. In many of the case, ecoparks have been established at the cost of the up rooting tribal people living in the areas. In such cases, often, the tribal have actually no curable alternative bratras to makes a new settlement and they have nowhere else to go outside their original habitat. In most of the cases the ecopark authority is ignoring the opinion and participation of the local people. This has created conflicts between local people and park authority. Our study also explores how ecopark projects exploited the ecological integrity of park-area. The study also endeavours to suggest some suggestions to overcome the existing problems and to develop an eco-friendly strategy for establishing eco-park which would help to preserve natural biodiversity, as well as can enrich natural regeneration with the wellbeing of local people.*

১.০ ভূমিকা

পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে মেলবন্ধন। কিন্তু বিজ্ঞান ও উন্নয়ন ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর নানান প্রান্তে যে পরিবেশ-ধ্বসংযজ্ঞ হচ্ছে তা এই মেলবন্ধনে ছেদ ঘটাচ্ছে। এই ছেদের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পরিবেশ-সচেতন মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। এই ভাবনার মধ্যে আমরা যখন দেখতে পাই আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক অপতৎপরতা, ব্যবসায়িক মনোবাঞ্ছা, কিংবা বিশেষ কোনো জাতিগোষ্ঠীর উপর দলন পরিচলনের মতলব তখনই পরিবেশ-প্রকৃতি নিয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এ পর্যন্ত যে কয়টি ইকোপার্ক গড়ে উঠেছে তার ভৌগোলিক অবস্থান, স্থান নির্বাচন এবং সাংস্কৃতিক দলনের তথ্যাদি অনেক প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে। এ পর্যন্ত আমরা যে কয়টি ইকোপার্ক প্রকল্প হাতে নিয়েছে তার সিংহভাগই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়। সবকয়টি ইকোপার্কের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অরণ্য-সংস্কৃতি নির্ভর জাতিগোষ্ঠী। লক্ষ করা যাক: ক. মধুপুরে : গারো ও কোচ নৃগোষ্ঠী জনগণের বসবাস, খ. গজনী : কোচ ও মান্দি নৃগোষ্ঠী জনগণের বসবাস, গ. মধুটিলায় : মান্দি, কোচ ও হাজং নৃগোষ্ঠী জনগণের বসবাস, ঘ. মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়ায়: খাসিয়া ও মান্দি নৃগোষ্ঠী জনগণের বসবাস, ঙ. চিম্বুক পাহাড় এলাকায়: ম্রো, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চংগা এবং চাকমা নৃগোষ্ঠী জনগণের বসবাস, চ. আলুটিলায়: ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

জনগণের বসবাস। ইকোপার্ক প্রকল্পের স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকাসমূহ নির্বাচন করা হচ্ছে। তাহলে কি ইকোপার্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে 'সামাজিক সংস্কৃতির অধিগ্রহণ মনোবৃত্তি'? যে মনোবৃত্তির উৎসে রয়েছে ঔপনিবেশিক চিন্তা-চেতনা ও তার দার্শনিক শিক্ষা। এ শিক্ষার উপর ভর করেই আমরা পাহাড়ের অধিবাসীকে বলছি উপজাতি (?) । এ নামকরণের মধ্যেই রয়েছে দাপুটে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে ক্ষুদ্র-জনগোষ্ঠীর অসহায় বাস্তবতা। একদিকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবোধ, ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অগাধ ভক্তি ও সংরক্ষণবাদী মনোবৃত্তি, অন্যদিকে আধিপত্যবাদী স্বরূপ-এই দুটি সাংস্কৃতিক উপাদানের উৎপাতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি হয়ে উঠছে 'ভূলুণ্ঠিত সাংস্কৃতিক সত্তা' অন্যদিকে বৃহৎজনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি হয়ে উঠছে 'আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক বলয়' । স্বরূপের দিক থেকে দুটি আলাদা, স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন নিজেকে পরিণত করছে 'দলনকারী' হিসাবে, অন্যজন 'দলিত' হিসাবে। আর এই দ্বৈতবাদী চরিত্রের প্রকাশিত রূপই হলো উন্নয়ন, সেটা হোক 'ইকোপার্ক উন্নয়ন' বা অন্যকোনো উন্নয়ন। প্রবন্ধে ইকোপার্ক উন্নয়নের এ দিকটি আলোকপাত করার পাশাপাশি ইকোপার্কের ভৌগোলিক অবস্থান, ইকোপার্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সংঘটিত প্রতিবেশবাদী সংকটের একটি স্বরূপ তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১.২ গবেষণা প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইকোপার্ক প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এসব এলাকায় পরিবেশ-বৈরী কর্মকাণ্ডকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইকোপার্ক উন্নয়ন পর্যবসিত হয়েছে তথাকথিত কর্মকাণ্ডে। যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সারাপৃথিবী জুড়ে ইকোপার্ক উন্নয়ন হয়েছে-তার মর্মকথা হল "বিশেষ অঞ্চলে জন্মানো ও বসবাসরত উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের" মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক রেখে সে সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুধাবনের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি সহনশীল হওয়া। এই সহনশীলতা একদিকে যেমন প্রকৃতিকে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করবে, অন্যদিকে নান্দনিক বোধ-বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে পরিশীলিত মানব সম্প্রদায় সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইকোপার্ক উন্নয়ন বা ইকো-ট্যুরিজম ইতিবাচক। কিন্তু বাংলাদেশে ইকোপার্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আদিবাসী এলাকায় যে রক্তপাত হয়েছে, আধিপত্যের মহড়া হয়েছে তাতে কী ইকোট্যুরিজমের মূল লক্ষ্যকে ব্যহত করা হয় নি? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করাই আমাদের গবেষণার লক্ষ্য।

এ গবেষণা কর্মটি আমাদের 'প্রতিবেশবাদী' ভাবনার ক্ষেত্রে সমন্বিত ন্যারেটিভ তৈরি করতে সহায়ক হতে পারে। সমন্বিত ন্যারেটিভ দুটি বিপরীতমুখী ন্যারেটিভ প্রাণময়-প্রাণহীন এবং মানুষ-প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান দ্বৈততার একটি ইতিবাচক সমাধান দাঁড় করাতে সক্ষম হবে। তাছাড়া এধরনের সমন্বিত ন্যারেটিভ আচরণের মধ্যে যৌক্তিক বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম। এই সমন্বিত মনোভাব আধিপত্য বিস্তারকারী মনোভাবের বিপরীত এবং এর মধ্যে রয়েছে সৌহার্দপূর্ণ উদার মনোভাব যা সামাজিক সঙ্কট এবং পরিবেশগত সঙ্কট নিরসনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। প্রকৃতির প্রতি মানুষের মমত্ববোধ এবং উভয়ের মধ্যে গভীর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে । ন্যারেটিভের ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা পরিবেশ সম্বন্ধে তথা সমাজস্থ অবহেলিত মানুষ (নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী) সম্পর্কে সমতাবাদী (egalitarian)

দৃষ্টিভঙ্গি ধারণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। সুতরাং এই গবেষণা কর্মটি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে যে, সামাজের সদস্যদের প্রতি এবং পরিবেশের প্রতি আমাদের দায়বোধকে নৈতিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত করতে হবে।

১.৩ অনুসৃত গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণায় অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি (Empirical Method) অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির অংশ হিসাবে ইকোপার্ক উন্নয়নের জন্য গৃহীত এলাকা সরেজমিনে তদারক করা হয়েছে। ফলে সেখানকার পরিবেশের উপর বিদ্যমান সংকটের একটি চিত্র প্রতিবেদন দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি এই উন্নয়ন প্রজেক্টের অধীনে গৃহীত কর্মসূচি এবং পরিবেশ-সংকট, আদিবাসীর প্রাত্যহিক জীবনে এবং পরিবেশ সংকটের প্রভাবে তাদের প্রান্তিক হবার ঘটনার প্রত্যক্ষ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই উপাত্তের ভিত্তিতে ইকোপার্ক উন্নয়ন কিভাবে প্রতিবেশবাদী ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে তার একটি ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করা হয়েছে। অভিজ্ঞাতমূলক বর্ণনার পাশাপাশি প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে একটি মূল্যায়নমূলক অভীক্ষা (Evaluative Exposition) পরিচালনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গবেষণা প্রকল্পটি মূলত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য/উপাত্তের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা বিভিন্ন ইকোপার্ক প্রকল্পসমূহ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি।

২.০ বাংলাদেশে ইকোপার্ক উন্নয়ন : তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

২.১. স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে ইকোপার্ক কী ? আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের জীবন-যাত্রাকে সহজ ও আরামদায়ক করেছে, কিন্তু মানব জীবন এবং তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতকে করে তুলেছে জটিল ও যান্ত্রিক। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার আবার মানুষের প্রতিপক্ষ হয়েও কাজ করছে। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনবার কৌশল অর্জন প্রাকৃতিক সম্পদকে দ্রুত নিঃশেষ করতে সাহায্য করছে। রাসায়নিক পদার্থের অবাধ ব্যবহার আমাদের পরিবেশ-প্রকৃতিকে বিষিয়ে তোলার পাশাপাশি মানব-স্বাস্থ্যকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। এসব সংকটের বাস্তবতা থেকে পরিত্রাণ পাবার প্রচেষ্টা হিসাবেই মানুষের মধ্যে পরিবেশ-সংবেদনশীলতা তৈরী হচ্ছে। মানুষ এখন দ্ব্যার্থহীন কণ্ঠে আকুতি করছে " ফিরিয়ে দাও অরণ্য, লহ হে নগর"। এই আকুতিই অভিব্যক্ত হচ্ছে পরিবেশবাদী আন্দোলনে। জাতি, রাষ্ট্র, একাডেমিক জগতে সর্বত্র এখন এ সংশ্লিষ্ট আলোচনা।[৮] এরই অংশ হিসাবে ইকোপার্ক একটি পরিবেশবাদী-প্রপঞ্চ হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। ইকোপার্কের সাধারণ ধারণাটি এ প্রসঙ্গে লক্ষ করা যেতে পারে। মানুষের সঙ্গে পরিবেশ-প্রকৃতি, তার বিভিন্ন উপাদান উদ্ভিদ, প্রাণী এবং ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানোই ইকোপার্ক ধারণাটির লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশেষ কোনো বনাঞ্চলকে পরিবেশ-বিনোদনের উপযোগী করে তোলাই ইকোপার্ক। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বনাঞ্চল সুরক্ষা, বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণের প্রতি সচেতন হওয়া, পরিবেশ উপযোগী বনায়ন ত্বরান্বিত করাই ইকোপার্কের আরো কতোগুলো সহযোগী লক্ষ্য। স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠা বনভূমিকে মানুষের ভ্রমণ উপযোগী করে তোলা এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার মধ্যে পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলাই হলো ইকোপার্কের অন্যতম লক্ষ্য।

২.২ ইকোপার্ক এবং ইকোট্যুরিজম : ইকোপার্কের প্রথম লক্ষ্যটি মানুষের সঙ্গে পরিবেশের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটানো, আর দ্বিতীয় লক্ষ্যটি পরিবেশসম্মত ভ্রমণকে উৎসাহিত করা। ১৯৯৭ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরিবেশ মন্ত্রীদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ইকোট্যুরিজমকে উৎসাহিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ট্যুরিজম সম্পর্কে কতোগুলো সাধারণ নীতি গৃহীত হয়[২]। গৃহীত নীতিসমূহ হলো :

১. ট্যুরিজমকে অবশ্যই পরিবেশগতভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে ধারণযোগ্য উন্নয়নের (sustainable development) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই জীব-বৈচিত্র্যের নিয়ম অনুসরণ করে এর লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

২. প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় ট্যুরিজম-কর্মকাণ্ডকে সহায়ক ভূমিকায় রাখতে হবে। পাশাপাশি ট্যুরিজম শিল্প থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে লাভবান হতে হবে।

৩. ট্যুরিজম-কর্মকাণ্ডকে অবশ্যই প্রতিবেশতন্ত্রের (ecosystem) ঐক্য এবং বসবাসরত প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। যেসব এলাকায় ট্যুরিজমের কারণে পরিবেশ-প্রকৃতির উপর চাপ সৃষ্টি হয় সেসব এলাকাকে ট্যুরিজমের আওতার বাইরে রাখতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যমান ট্যুরিজম কর্মকাণ্ডকে আধুনিকায়ন, সংস্কার করতে হবে।

৪. ট্যুরিজমের কারণে সংঘটিত পরিবেশ-প্রকৃতি এবং জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষতির পরিমাণ হ্রাসমান রাখার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তা পরিমাপ করার জন্য EIA (environmental impact assessment) ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫. ট্যুরিজমের বিকাশে ব্যবহৃত প্রযুক্তিকে অবশ্যই পানি, শক্তি সংরক্ষণে রক্ষণশীল হতে হবে। দূষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা, রিসাইক্লিং প্রক্রিয়া, এবং বর্জ্য নিঃসরণ-প্রক্রিয়া পরিবেশসম্মত হতে হবে।

৬. সকল স্টেকহোল্ডার যেমন : সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহকে ধারণযোগ্য ট্যুরিজমের জন্য ভূমিকা রাখতে হবে।

৭. ট্যুরিজমকে ধারণযোগ্য করার জন্যই এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দক্ষ কর্মিবাহিনী গড়ে তোলা উচিত।

ক = ট্যুরিজম (পরিবেশবাদী শর্তসহ), ►—◄ খ = ট্যুরিজমের জন্য পরিবেশসম্মত স্থান ► ইকোপার্ক

▼

গ= (ক+খ) ► ইকোট্যুরিজম

ডায়াগ্রাম ১ : ইকোট্যুরিজমের সাংগঠনিক কাঠামো

বার্লিন ঘোষণার উপর্যুক্ত নীতিমালাসমূহ সাধারণভাবে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েছে তা একান্তই পরিবেশ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং ধারণযোগ্য উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এ দিক থেকে ট্যুরিজম ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশবাদী আলোচনাকে সামনে নিয়ে এসেছে। পরিবেশবাদী এ ধারাটিই ইকোপার্কের ধারণাকে নতুন আঙ্গিক দিতে সমর্থ হয়েছে।

ট্যুরিজম বিনোদনের একটি প্রাচীন মাধ্যম। কিন্তু সমকালীন পরিবেশ সংকটের পরিপ্রেক্ষিত ট্যুরিজমকে নতুনভাবে বিন্যাস করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে এই বিন্যাসের কয়েকটি শর্ত জোড়ালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ধারণযোগ্য উন্নয়নের নীতিকে (principle of sustainable development) অনুসরণ করা, এই উন্নয়ন পরিবেশসম্মত কি-না তা নির্ধারণের জন্য উন্নয়নের দুটি কৌশল : স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল এসেসমেন্ট এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপেক্ট এসেসমেন্ট বিধিবদ্ধভাবে অনুসরণ করা অবশ্যক। সর্বোপরি বলা যায় ট্যুরিজমের পরিবেশসম্মত ধারাটিই ইকোট্যুরিজম, আর ইকোট্যুরিজমের সঙ্গে ইকোপার্কের ধারণা অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত। নিম্নের চিত্রটি লক্ষ্য করা যাক। এখানে 'ক' বৃত্তটি দ্বারা ট্যুরিজমকে, 'খ' বৃত্তটি দ্বারা ট্যুরিজমের জন্য পরিবেশসম্মত স্থান ইকোপার্ককে, সর্বোপরি 'গ' বৃত্তটি ইকোট্যুরিজমকে নির্দেশ করছে। উপর্যুক্ত তিনটি ধারণা পরস্পর অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। তাহলে ইকোপার্ক ইকোট্যুরিজমেরই অংশ। এই তিনটি উপাদানের পারস্পরিক সংশ্লিষ্টতাকে নিচের ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে:

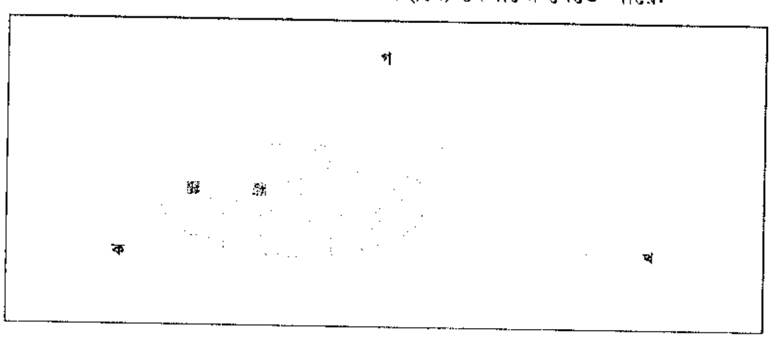

ডায়াগ্রাম ২ : ইকোট্যুরিজম, ইকোপার্ক এবং পরিবেশ পারস্পরিক সম্পর্ক

পরিবেশবাদী পরিপ্রেক্ষিতের কারণেই ট্যুরিজমের সঙ্গে পরিবেশ প্রত্যয়টি অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। পরিবেশসম্মত ভ্রমণকে কয়েকটি দিক থেকে দেখানো যেতে পারে:

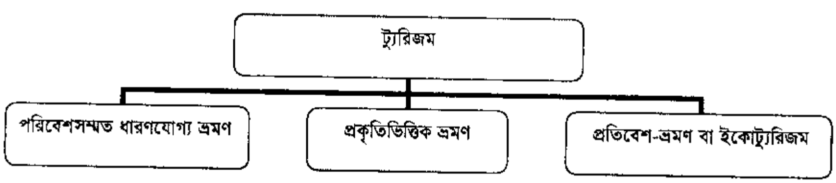

ডায়াগ্রাম ৩ : ট্যুরিজমের ধরন-প্রকৃতি

পরিবেশসম্মত ধারণযোগ্য ভ্রমণ (environmentally sustainable tourism) ধারণযোগ্য উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ধারণযোগ্য উন্নয়ন হলো প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার শর্তটি

চিন্তায় রেখে বর্তমান প্রয়োজন এবং ভবিষ্যত প্রয়োজন সাপেক্ষে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। এই উন্নয়নে ১. পরিবেশসম্মত শর্তসমূহ মেনে নেওয়া হয়, ২. কোনো উন্নয়ন কর্মসূচি যেন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর না হয় সে দিক লক্ষ রেখে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এবং ৩. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় এমনসব বিকল্প নিয়ে চিন্তা করাই ধারণযোগ্য উন্নয়নের মূলকথা। উন্নয়নের এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ট্যুরিজমের যে বিকাশ হয়েছে তা-ই ধারণমূলক ট্যুরিজম (sustainable tourism)।

প্রচলিত ধারার ট্যুরিজম প্রায়ক্ষেত্রেই পরিবেশ-বিরোধী হয়ে থাকে। এমন কি অনেক সময়ই দার্শনিক বোধ-বিবেচনা বাদ দিয়েই ট্যুরিজম সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আর ট্যুরিজম বলতে যদি আমরা অনন্দদায়ক বিনোদনকে বুঝি তাহলে তা সংকীর্ণ সংজ্ঞা হয়ে যাবে। ট্যুরিজমের সংজ্ঞায় Przeclawski বলেন, জীবনের ঐচ্ছিক গতিময়তা যা অল্পসময়ের জন্য স্ব-গৃহ ত্যাগ করে প্রাকৃতিক-পরিবেশে ভ্রমণ করাকে বুঝায়।[৩] ট্যুরিজমের এই সংজ্ঞায় বিশেষ কোনো প্রেষণাকে না বুঝিয়ে বরং জনসাধারণের ক্ষণিক সময়ের স্থান পরিবর্তনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ট্যুরিজমের এই ধারণাটি ইকোট্যুরিজমের মূল-ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইকোট্যুরিজমেরও বিভিন্ন সংজ্ঞা বা শ্রেণীকরণ রয়েছে। অনেকসময় ইকোট্যুরিজম বলতে দায়সারাগোছের স্থান দর্শনকে বুঝানো হয়ে থাকে।[৪] ইকোট্যুরিজমের এ সংজ্ঞায় একজন ভ্রমণকারীর পরিবেশের প্রতি কোনো দায়বোধ শেখানো হয় না, এমনকি পরিবেশগত প্রভাব, অংশগ্রহণকারী ট্যুরিস্টদের (ভ্রমণকারীর) মূল্য এবং প্রেষণা নিয়েও কিছু শেখানো হয় না। নৈতিক বা দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত ট্যুরিজমকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। Przeclawski প্রথম ট্যুরিজমকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নীতিতত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসেন। তিনি এ বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন 'Deontology of Tourism' শব্দগুচ্ছ দ্বারা।[৫] আরেকজন পরিবেশবাদী তাত্ত্বিক:নেলসন 'ইকোট্যুরিজম' ধারণাটিকে বুঝাতে গিয়ে কতোগুলো নীতি ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন যা এর মধ্যে অন্তর্নিহীত থাকে। নিচের তালিকাটি দেখা যাক[৬]:

ইকোট্যুরিজম ▶ **পরিবেশগত নীতি**
পরিবেশ নৈতিকতা
পরিবেশগত সচেতনতা

ইকোট্যুরিজমের নীতিমালা▶

১. প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতিসাধন না করা।

২.পরতঃমূল্য অপেক্ষা স্বতঃমূল্যের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. মানবকেন্দ্রিক অপেক্ষা প্রাণকেন্দ্রিক হতে হবে। আর ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা পরিবেশের স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে।

৪. ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের লাভটাকে প্রাধান্য দিতে হবে। অন্য কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা এখানে গুরুত্ব পাবে না।

৫. ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে প্রাকৃতিক-পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবে।

৬. ইকোট্যুরিজমকে অবশ্যই প্রাকৃতিক-পরিবেশসম্মত হতে হবে।

৭. ইকোট্যুরিজমের দুটি বাস্তবতার দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে: জ্ঞানগত (তথ্যমূলক) এবং ফলদায়ক (আবেগমূলক)।

সারণি ১ : ইকোট্যুরিজমের নীতিমালা

ভ্রমণ বা বিনোদনকে পরিবেশসম্মত করার তাগিদ থেকে ইকোট্যুরিজম । আর কোনো এলাকার পরিবেশ-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, পরিবেশ সম্পর্কিত বোধ-উপলব্ধি বৃদ্ধি করা এবং বিনোদনের মধ্য দিয়ে পরিবেশসম্মত-চেতনা শাণিত করাই ইকোট্যুরিজমের লক্ষ্য । তাহলে আমরা বলতে পারি ট্যুরিজমের সমকালীন স্বরূপটি পরিবেশবাদী শর্তের উপর অনিবার্যভাবে নির্ভরশীল । এই শর্তটির উপর ভিত্তি করে ইকোপার্ক ধারণাটি আমদানি করা হয়েছে । সমকালীন ইকোপার্ক ধারণাটির সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে তিনটি শর্ত : ধারণযোগ্যতা (sustainability), প্রকৃতি নির্ভরতা (nature-based) এবং পরিবেশ-কেন্দ্রিকতা (ecocentric) । উন্নয়নের দিক থেকে ইকোট্যুরিজমের সঙ্গে ইকোপার্কের কতোগুলো সাধারণ শর্ত বিদ্যমান রয়েছে । এই শর্তসমূহের সাধারণ ছেদকে নিচের ডায়াগ্রামে দেখানো হলো:

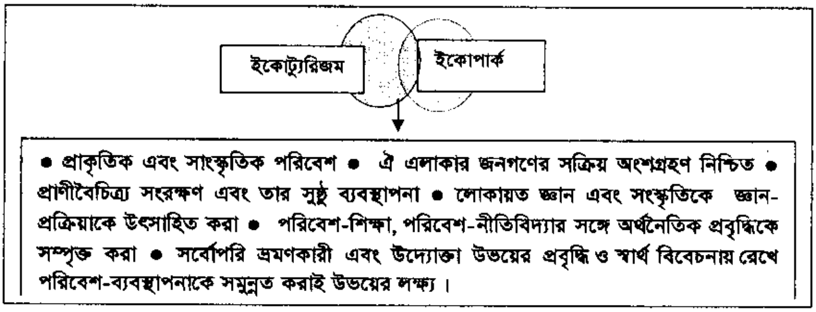

ডায়াগ্রাম ৪ : ইকোট্যুরিজম ও ইকোপার্কের বৈশিষ্ট্য

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়: সমকালীন পরিবেশগত সংকট মানুষের জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে উন্নয়নের নীতি পর্যন্ত সকলকিছুকে পরিবেশসম্মত করে দেখার প্রবণতা তৈরী হয়েছে । এই প্রবণতাই বিনোদন ভ্রমণকেও পরিবেশসম্মত পন্থায় চিন্তা করার জন্য বিশ্ব জাতিগোষ্ঠীর সংগঠন ইউ.এন.ও'র অঙ্গ সংগঠনসমূহ ইকোট্যুরিজমের প্রস্তাব করছে । ইকোট্যুরিজমের বিকাশর সঙ্গে সঙ্গে বিনোদনের জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান যা পরিবেশ-প্রকৃতি পরিবেষ্টিত তাদেরকে বিনোদন স্থানের আওতায় আনা হচ্ছে । ভ্রমণ যেখানে পরিবেশ-প্রকৃতিকেন্দ্রিক স্বাভাবিক কারণে ভ্রমণের স্থানসমূহকে অনুরূপ হবার প্রয়োজন রয়েছে । এই উপলব্ধি থেকেই ইকোপার্ক ধারণার জন্ম ।

২.২. রিজার্ভ ফরেস্ট ও ইকোপার্ক : নিরাপদ-বনজ এলাকা এবং রিজার্ভ ফরেস্ট সমকালীন পরিবেশবাদী ভাবনার আরেকটি দিক । বনজ-এলাকাসমূহকে কোনোপ্রকার বিনষ্ট না করে সংরক্ষণ করাই রিজার্ভ ফরেস্টের ধারণা । ১৯৭৪ সালে প্রবর্তিত Bangladesh Wildlife Preservation Act-1974' রিজার্ভ ফরেস্টের ধারণা প্রবর্তণ করে । আন্তর্জাতিক IUCN এর ঘোষণা মোতাবেক এই অ্যাক্টে তিন ধরনের বনজভূমিকে রিজার্ভ ফরেস্টের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয় । তাদের বাসস্থান নিরাপদ রাখার জন্য 'বন্যপ্রাণী নিয়ন্ত্রণ' এলাকা' প্রয়োজন, উদ্ভিদ এবং প্রাণী বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য 'জাতীয় উদ্যান' এবং গেইম রিজার্ভ –এই তিনটিই রিজার্ভ ফরেস্টের অংশ । তন্মধ্যে জাতীয় উদ্যানসমূহই ইকোপার্ক বা বিনোদন পার্কের মর্যাদা লাভ করেছে ।

৩. বাংলাদেশের ইকোপার্কের বিবরণ

এশিয়ার অনেক দেশ ট্যুরিজমে বৈচিত্র্য আনার জন্য তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীবৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ-বৈচিত্র্য নিয়ে মাঠ পর্যায়ের গবেষণাকে আরো সংহত করার জন্য ইকোপার্ক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তবে এটাও সত্য বিশ্ব পুঁজিবাদী বিকাশের সঙ্গে পণ্যের পুরোনো তালিকায় কিছু সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে, এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি নিজেও সংযোজিত হয়েছে পণ্য হিসাবে। সারা পৃথিবী জুড়ে ইকোপার্কের স্থান নির্ধারণে যে ভূগোল ও সংস্কৃতিকে নির্বাচন করা হচ্ছে তাতে দলন ও আধিপত্যের সহযোগী হিসাবে অবস্থান করছে। সারা পৃথিবীর ইকোপার্কসমূহের যদি একটি তালিকা তৈরি করা হয় তাহলে দেখা যাবে প্রকৃতি-সংস্কৃতি বা অরণ্য-সংস্কৃতি নির্ভর জাতিগোষ্ঠীসমূহের অবদমনের যে চিত্র উপস্থাপিত হয় তা বলা বাহুল্য। বাংলাদেশও সেই প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার ইকোট্যুরিজমের বিকাশ এবং জাতি-পরিবেশবিদ্যার (ethno-ecology) জ্ঞানকে আরো বর্ধিত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইকোপার্ক উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। বাংলাদেশের ইকোপার্কসমূহের তালিকা নিচের সারণীতে লক্ষ করা যেতে পারে: ইকোপার্কের তালিকা:১. সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক (চন্দ্রনাথ, চট্টগ্রাম), ২. মাধকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপাক (মৌলভীবাজার), ৩. মধুপুর ইকোপার্ক (মধুপুর, টাঙ্গাইল), ৩. মধুটিলা শালবন ইকোপার্ক (শেরপুর), ৪. চিম্বুক ইকোপার্ক (বান্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম), ৫. গজনী ইকোপার্ক (শেরপুর), ৬. বাঁশখালী ইকোপার্ক (কুতুবদিয়া), ৭. নারিকেল জিঞ্জিরা (সেন্টমার্টিন, চট্টগ্রাম), ৮. আলুটিলা (খাগড়াছড়ি), ৯. মধুটিলা (শেরপুর), ১০. দুলাহাজরা সাফারি পার্ক (দুলাহাজরা, কক্সবাজার), ১১. গাজিপুর জাতীয় উদ্যান (গাজিপুর), ১২. কুয়াকাটা (পটুয়াখালী), ১৩. ধানসিড়ি (ঝালকাঠি)। নিচের বাংলাদেশের মানচিত্রে ইকোপার্কের অবস্থানসমূহকে নিদের্শ করা হলো :

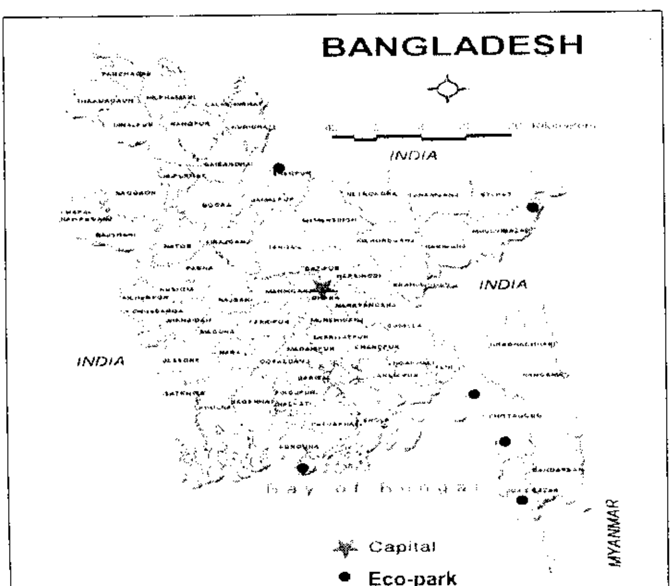

মানচিত্র ১: বাংলাদেশের ইকোপার্কসমূহের অবস্থান

৩.১ নিচে কয়েকটি ইকোপার্কের বর্ণনা দেওয়া হলো[৭]:

সীতাকুণ্ডু ইকোপার্ক: ১৯৯৯ সালে ইকোট্যুরিজমের বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত ইকোপার্ক প্রকল্পের প্রথম অভিযাত্রা শুরু হয় চন্দ্রনাথ রিজার্ভ ফরেস্ট দিয়ে। প্রাণীবৈচিত্র্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে সীতাকুণ্ডু বোটানিক্যাল গার্ডেনকে সীতাকুণ্ডু ইকোপার্কে রূপান্তরিত করা হয়। মুললক্ষ্য হিসাবে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়। নিচের সারণিটি লক্ষ করা যাক:

	প্রতিষ্ঠাকাল ও অর্থায়ন	ভৌগোলিক অবস্থান	আয়তন ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
সীতাকুণ্ডু ইকোপার্ক	১. ২০০১ সালে উদ্বোধন করা হয়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে তার কাজ শুরু হয়। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে তা সম্পন্ন হয়। ২. প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ধরা হয় : ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যায় ধরা হলেও পরবর্তী সময়ে সংশোধনী বাজেটে এই ব্যায় ধরা হয় ৯.৯৮ কোটি টাকা।	চট্টগাম শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড় ও এর সুবিস্তৃত এলাকা নিয়ে উত্তর-দক্ষিণে আড়াআড়ি করে এই পার্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়।	আয়তন : সর্বমোট ১৯৯৬ একর ভুমির উপরে এই ইকোপার্কটির অবস্থান। বসবাসকারী জনগোষ্ঠী: সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমান, হিন্দু এবং নিম্নবর্গের কয়েকটি জনগোষ্ঠীর সদস্য রয়েছে।

সারণি ২ : সীতাকুণ্ডু ইকোপার্কের বিবরণ

সীতাকুণ্ডু ইকোপার্কে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে এর পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত বিভিন্ন মন্দিরের অবস্থিতি, 'সপ্তধারা' নামে প্রকৃতিক ঝরণা, বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, পশু-পাখি পার্কটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। কিন্তু পার্কটির ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা, সরকারি বরাদ্দে জটিলতা ইত্যাদিসব কারণে পার্কটির কর্মিদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। এর সঙ্গে পার্কে দর্শনার্থিদের অবাধ বিচরণ, পরিবেশ-বিনষ্টকারী উপাদানসমূহের অনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি মিলিয়ে সীতাকুণ্ডু ইকোপার্ক তার আগের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে।। কিন্তু চন্দ্রনাথ পাহাড় ও তার পাদদেশে বাঁশ, বেত, ভেষজ উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতির সমাহার ভিন্ন অঙ্গিক দিতে সক্ষম হয়েছে।

৩.২. মধুপুর ইকোপার্ক : মধুপুরের শালবন এলাকায় 'মধুপুর ইকোপার্কটি' গড়ে উঠেছে। ধারণা করা হয় আর্যসভ্যতা গড়ে উঠার পূর্ব থেকে বিশাল শালবনে মান্দি জনগোষ্ঠী স্বধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনধারা নিয়ে বসবাস করে আসছে। তাদের জীবনধারার সঙ্গে সেখানকার প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সমমাত্রায় অভিযোজন করে আসছে। মধুপুর এলাকার গভীর অরণ্যে বসবাসরত এই জনগোষ্ঠীর ইতিহাস হাজার বছরেরও বেশি সময়ের। নানা প্রতিবাদ সত্ত্বেও মুধপুরের শালবন বিনষ্টের মধ্য দিয়ে সেখানে 'মধুপুর ইকোপার্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়।

	প্রতিষ্ঠাকাল ও অর্থায়ন	ভৌগোলিক অবস্থান	আয়তন ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
মধুপুর ইকোপার্ক	১. ২০০০ সালে এডিবির অর্থায়নে এই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। ২. প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ধরা হয় : ৯ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় এই বনটির অবস্থান। পূর্বে গাজিপুরের ভাওয়াল শালবনের সঙ্গে এর সংযোগ ছিলো।	আয়তন : মধুপুর গড়ের ৩০০০ একর এলাকা ঘিরে এই ইকোপার্কটির অবস্থান। বসবাসকারী জনগোষ্ঠী: এই এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আদিবাসী মান্দি জনগোষ্ঠী। একানে কচে-জনগোষ্ঠীরও বসবাস রয়েছে।

সারণি ৩ : মধুপুর ইকোপার্ক

মধুপুরের আদি-জনগোষ্ঠী মান্দিদের শালবন এলাকার বিশাল অংশ জুড়ে প্রকৃতি-সংস্কৃতি উপর ভর করে নিরুপদ্রবভাবে বসবাস করে আসছিলো। প্রকৃতি-সংস্কৃতির মুলধারায় বসাবাসকারী এই জনগোষ্ঠী ১৮৬৫ সালে সাকসেশন আইনের মাধ্যমে ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি পায়। কিন্তু ১৯২৭ সালে বৃটিশ সরকার মধুপুর পরগণাকে জমিদারের দায়িত্বে হস্তান্তর করেন। নাটোর জমিদার রাজা যুগিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সম্পূর্ণ বনাঞ্চলটি দেবতা গোবিন্দের নামে উৎসর্গ করেন। এসময়ে গারোরা তাদের বনজ-ভূমির উপর নামমাত্র খাজনায় পরিপূর্ণ অধিকার ভোগ করতে পারে। ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সরকার মধুপুর-বন এলাকাকে বনবিভাগের আওতায় আনা হয়, এতে করে বনজ-ভূমির উপর গারোদের কর্তৃত্ব লোপ পাবার ইতিহাস শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৫ সালে সংরক্ষিত বনাঞ্চল, এবং ১৯৬২ সালে অস্থানীয় বাঙালিদের দ্বারা সে এলাকার বনভূমি বিনষ্ট হতে শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে এ এলাকা 'জাতীয় উদ্যান' হিসাবে ঘোষিত হবার মধ্য দিয়ে মুল-অধিবাসী গারোরা তাঁদের বনজ-সংস্কৃতি, বনের উপর তাদের অধিকার সব কিছু হারায়ে ফেলে। আদিবাসী গারোদের বন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সরকারিভাবে শুরু হয়েছে বনজ-সম্পদের উপর দলন। সেখানকার ভূ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃক্ষাদি নিধন করে 'সামাজিক বনায়নের' নামে রাক্ষুসী এবং পরিবেশ-বৈরী উদ্ভিদ বপন করা হচ্ছে। এসবের মধ্য দিয়ে মধুপুর হারিয়ে ফেলছে তার অতীত প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্য।

ছায়াচিত্র ১: মধুপুর ইকোপার্কের জন্য নির্মাণাধীন সংস্কারকর্ম, (সূত্র : দি ডেইলি স্টার, ০২.০৩.২০০৭)

৩.৩. মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক : ২০০০ সালের ০৬ মার্চে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটে 'পরিবেশ-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ' শিরোনামে একটি প্রকল্প অনুমোদন করেন। সরকার দাবি করছেন এই পরিকল্পনার মাধ্যমে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে, অন্যদিকে বিলুপ্ত-প্রায় প্রাণী, পাখি এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	প্রতিষ্ঠাকাল ও অর্থায়ন	ভৌগোলিক অবস্থান	আয়তন ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক	১.১৯৯৯ সালে প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২০০১ সালের ১৫ এপ্রিল প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। ২. উক্ত প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয় ১১ কোটি টাকা।	মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানাধীন পাথারিয়া পাহাড়ের পশ্চিমে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত এবং কুলাউড়া থানাধীন পৃথিমপাশা অ্যাকোর্ড ফরেস্টের লুথিটিলার পাদদেশ মুরাইছড়া জলপ্রপাত। এই দুটি এলাকা নিয়ে মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক।	আয়তন : মাধকুণ্ডের ৬৬৭ একর, এবং মুরাইছড়ার ৮৩৩ একর সর্বমোট ১৫০০ একর ভুমি ইকোপার্কের জন্য অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়। বসবাসকারী জনগোষ্ঠী: মুরাইছড়ায় এবং মাধবকুণ্ড উভয় এলাকার সংখ্যাঘরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আদিবাসী খাসিয়া । মান্দি জনগোষ্ঠী ও রয়েছে।

সারণি ৪: মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্কের বিবরণ

মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক উন্নয়নের প্রভাব: জমি অধিগ্রহণের পাশাপাশি কিছু কিছু পাহাড় সমতল করার সিদ্ধান্ত ও এই পরিকল্পনারই অংশ হয়ে দাঁড়ায়। মোটর-যান চলাচলের জন্য রাস্তা সংস্কার এবং যাতায়াত উন্নয়নের ছুতোয় অসংখ্য বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ বিনষ্ট করা হয়। রজত কান্তি গোস্বামী[৮] আমাদেরকে জানান : ইকোপার্ক উন্নয়নের এই তৎপরতার ফলে দশটি খাসিয়া পঞ্জি (আদিবাসী গ্রাম), অন্য হিসাবে এক হাজার আদিবাসী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব পরিবারের সদস্যদের কোনোপ্রকার পুনর্বাসন না করেই তৎকালীন সরকার এই প্রকল্পটি হাতে নেয়। সেখানকার বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কোনোপ্রকার আলোচনা ছাড়াই এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশেষ করে ঐ এলাকায় বসবাসরত খাসিয়া এবং গারো জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও অর্থনৈতিক উৎস হিসাবে যেসব উদ্ভিদ লতাপাতা ব্যবহৃত হয় তা নির্মূল করা হয়েছে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নেতা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ধর্না দিয়ে আশ্বাস পেয়েছিলেন সে এলাকার আদিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। কিন্তু সে আলোচনার আর প্রয়োজন হয় নি। আলোচনা ছাড়াই মাধবকুণ্ড ঝর্ণা এবং সেখানকার গভীর আরণ্য নিয়ে পর্যটনকুঞ্জ, অন্যভাবে বলা হচ্ছে ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরিকল্পনাহীন এই ইকোপার্ক এর মধ্য দিয়ে যেমন পরিবেশ-বৈচিত্র্য নষ্ট হয়েছে, সেই পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে উঠা জনগোষ্ঠীও আবাসস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

৩.৪. বাঁশখালী ইকোপার্ক : ২০০৪ সালের দিকে বাঁশখালী উপজেলার জলদা বনবিটের আওতাধীন 'রামের ছড়া এবং ডানের ছড়া' এ দুটি এলাকা নিয়ে 'বাঁশখালী ইকোপার্ক' গড়ে তোলার উদ্যোগ বন বিভাগ গ্রহণ করে।

	প্রতিষ্ঠাকাল ও অর্থায়ন	ভৌগোলিক অবস্থান	আয়তন ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
বাশঁখালী ইকোপার্ক	**প্রথম পদক্ষেপ:** এর আগে ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় ৭৭৬৪ হেক্টর বনভূমিকে চুনতি অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সবুজ বনভূমি, অরণ্য-পরিবেষ্টিত ভূ-প্রকৃতি ও পাহাড় নিয়ে আসা হয় এর আওতায়। 'ইফাদ' এর আর্থিক সহায়তায় বাঁশখালী ইকোপার্কের প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ১৯৯৩ সালের দিকে। ১৯৯৯ সালে বাঁশখালী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডানের ছড়ায় আরেকটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। **দ্বিতীয় পদক্ষেপ: ২০০৪ সালে** এর উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।	ইকোপার্কটির বাশঁখালী উপজেলা বামের ছড়া এবং ডানের ছড়ার সমন্বয়ে গঠিত। বামের ছড়ায় : জলদি, শীলকু এবং চাম্বল এলাকার সঙ্গে বাঁধ-নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে একত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে ফলে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। ২০০০ সালের দিকে ডানের ছড়া এবং বামের ছড়ার মধ্যবৃর্তি পাহাড় কেটে হ্রদ দুটিকে একত্রিত করা হয়। এই দুটি এলাকায় নিয়েই বাঁশখালী ইকোপার্ক।	আয়তন : বামের ছড়ার ২০ হেক্টও এবং ডানের ছড়ার এলাকর ৬০ হেক্টর মোট ৮০ হেক্টর এলাকায় নিয়ে বাঁশখালী ইকোপার্ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বসবাসকারী জনগোষ্ঠী: সাধারণ মৎস্যজীবী মানুষ।

সারণি ৫ : বাঁশখালী ইকোপার্কের বিবরণ

গভীর অরণ্য বিচিত্র পশুপাখি, উঁচু-নিচু টিলা এসব মিলিয়ে বাশখালী ইকোপার্কের ভূ-বৈচিত্র্য মনোরম ।

ছায়াচিত্র ২: বাঁশখালী ইকোপার্ক

৩.৫ চিম্বুক ইকোপার্ক : বান্দরবানের চিম্বুক পার্বত্য এলাকায় এ ইকোপার্কটি গড়ে উঠেছে। ইকোপার্কটি প্রতিষ্ঠার সময় স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী তীব্র প্রতিবাদ জানায়। চিম্বুক ইকোপার্ক সম্পর্কিত তথ্য নিচের সারণিতে দেয়া হলো:

	প্রতিষ্ঠাকাল ও অর্থায়ন	ভৌগোলিক অবস্থান	আয়তন ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
চিম্বুক ইকোপার্ক	**প্রথম পদক্ষেপ**: ২০০৪ সালের ৫ ডিসেম্বর চিম্বুক হিল রেঞ্জকে ইকোপার্ক হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাদ-প্রতিবাদের ফলে ইকোপার্কটি নির্মাণের ক্ষেত্রে চতুরতার আশ্রয় নেয়।	বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার এবং সদর-রুমা উপজেলার মাঝামাঝি এলাকার চিম্বুক হিলে গড়ে তোলা হয় এই ইকোপার্কটি।	আয়তন : রিজার্ভ বনাঞ্চলের ছয় একর জুড়ে অভয়ারণ্য গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করা হয়।। বসবাসকারী জনগোষ্ঠী: ম্রো, মারমা, ত্রিপুরা এবং তঞ্চংগ্যা

সারণি ৬ : চিম্বুক ইকোপার্ক

চিম্বুক ইকোপার্কটি ভ্রমণ-পিপাসু মানুষের জন্য মানসিক বিনোদনের জন্য নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ইকোপার্ক নীতিমালার আওতায় স্থানীয় বাসিন্দাদের অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি।

ছায়াচিত্র ৩: চিম্বুক ইকোপার্কে উদ্ভিদ-প্রাণী বৈচিত্র্য সমন্বয় (সূত্র : The Daily Star.net/2003/11/21.)

উপর্যুক্ত ইকোপার্ক ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি স্থানকে ইকোপার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তন্মধ্যে শেরপুরের গজনীতে শালবন ঘেরা ঘন-অরণ্য ভূমিকে ইকোপার্কের আওতায় নিয়ে আসা হয়। এই ইকোপার্কটিতে বিনোদনের নামে কৃত্রিম লেক তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্রগ্রামের বেশ কয়েকটি এলাকা যেমন, খাগড়াছড়ির মহালছড়ি, চিম্বুক হিল রেঞ্জ, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানের বিভিন্ন এলাকায় ইকোপার্ক নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। কিন্তু সে এলাকার জনগণের প্রতিবাদের মুখে শেষতক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইকোপার্ক উন্নয়নের পেছনের দর্শন হিসেবে যদিও বলা হয় জীববৈচিত্র্য রক্ষা, অভয়ারণ্য সৃষ্টি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় আদিবাসী আবার কোথাও-বা নিম্নবর্গের বাঙালি জাতিগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আর ইকোপার্কের সঙ্গে ইকোট্যুরিজমের ধারণা সম্পৃক্ত হবার ফলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর চালচিত্র আরো সঙ্কটাপন্ন। আমাদের বাস্তবতায় ইকোপার্ক গড়ে তোলার আন্তর্জাতিক কোনো বিধি অনুসরণ

করা হয় না। এমনকি এসইএ এবং ইআইএ সংশ্লিষ্ট যে বিধি রয়েছে তার কোনো মানদণ্ড এখানে অনুসরণ করা হয় না। চতুর্থ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস নেব।

৪. ১ বাংলাদেশের ইকোপার্ক : প্রতিবেশবাদী পরিপ্রেক্ষিত

পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে মেলবন্ধন। কিন্তু বিজ্ঞান ও উন্নয়ন ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যে পরিবেশ-ধ্বসংযজ্ঞ হচ্ছে তা এই মেলবন্ধনে ছেদ ঘটাচ্ছে। এই ছেদের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পরিবেশ-সচেতন মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। এই ভাবনার মধ্যে আমরা যখন দেখতে পাই আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক অপতৎপরতা, ব্যবসায়িক মনোবাঞ্ছা, কিংবা বিশেষ কোনো জাতিগোষ্ঠীর উপর দলন পরিচালনের মতলব তখনই পরিবেশ-প্রকৃতি নিয়ে রাষ্ট্রের বা কর্পোরেট-দালালদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশে ইকোপার্ক উন্নয়নের নামে গৃহীত 'ইকোপার্ক প্রজেক্ট কর্মসূচিতে' আমরা সেরকমটিই লক্ষ করছি।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতারও অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন ভূ-প্রাকৃতিক দিক থেকে সমতল এবং পাহাড় ভিন্ন জীবন-বৈচিত্র্যের ধারকবাহক হিসেবেও রয়েছে। পাহাড়ের অধিবাসীরা হয় উপজাতি (?) নতুবা আদিবাসী হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। নামকরণের দিক থেকে দাপুটে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে ক্ষুদ্র-জনগোষ্ঠী অসহায় এটাই স্বাভাবিক। এখানেই গ্রামসীয় 'হেজেমনি'র চূড়ান্ত দৃশ্যমানতা। একদিকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবোধ, ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অগাধ ভক্তি ও সংরক্ষণবাদী মনোবৃত্তি, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী রক্ষাযন্ত্র 'রাষ্ট্রের' আধিপত্যবাদী স্বরূপ-এই দুই সমসাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক উপাদানের উৎপাতে প্রান্তিক পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সত্তা ভূলুণ্ঠিত। তাহলে 'ভূলুণ্ঠিত সাংস্কৃতিক সত্তা' এবং 'আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক বলয়' স্বরূপের দিক থেকে আলাদা, মাত্রার দিক থেকে উঁচু-নিচু, সম্পর্কের দিক থেকে আধিপত্যবাদী। এসব অনুঘটনার মধ্যে আমরা পাই সেই দার্শনিক দ্বৈতবাদী চরিত্রের উপস্থিতি। এই দ্বৈতবাদী চরিত্রের প্রকাশিত রূপই হলো উন্নয়ন। যেমন উন্নয়নের নামে প্রথম পদক্ষেপে আমরা লক্ষ করি : পাহাড়ি এলাকায় বাঙালি সেটেলার (বসবাসকারী) প্রেরণ এবং তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা। দ্বিতীয় পদক্ষেপে আমর লক্ষ করি : পাহাড়ি এবং বনজ-সংস্কৃতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর (গারো, সাঁওতাল ইত্যাদি) ভোগ-দখলকৃত প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় অধিকার বাস্তবায়নের প্রয়াস। এই দুটি পদক্ষেপেই আমরা লক্ষ করছি দ্বৈতবাদী চরিত্রের অনুশীলন। এই অনুশীলনের নির্মম দৃষ্টান্ত হলো 'ইউএসএইডের অর্থায়নে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ'*। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন ইকোপার্ক প্রকল্পের নামে বস্তুতপক্ষে আদিবাসী জনগোষ্ঠী উচ্ছেদ প্রকল্প চলছে। কাপ্তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের দোহাই ছিল। অথচ এই দোহাইয়ের মধ্য দিয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি নৃ-জাতিগোষ্ঠীর বিশাল অংশ। রাজা দেবাশীষ রায় থেকে উদ্বৃতি দেয়া যাক-পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য এটা ছিল মানবসৃষ্ট এক মহাবিপর্যয়ের ঘটনা। এর ফলে প্রায় ১ লক্ষ স্থানীয় অধিবাসী, যাদের অধিকাংশই ছিল চাকমা, উদ্বাস্ত হয়েছে।[১০]

ইতোমধ্যে সরকার ইকোট্যুরিজমের বিকাশ ও এ খাত থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে ইকোপার্ক স্থাপনের বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। মাধবকুণ্ড-মুরইছড়া, মধুপুর ও

চিম্বুক ইকোপার্ক প্রকল্প তন্মধ্যে কয়েকটি। এই প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে একদিকে যেমন আদিবাসী বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, অন্যদিকে আদিবাসী সংস্কৃতি ও জীবনবোধের নানা ধারা-উপধারাসমূহকে বিলুপ্ত করার কাজও চলছে। উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে আদিবাসী এবং তাদের ভূমিকে বেছে নেবার পশ্চাতে দ্বৈতবাদী অপদর্শনটি কাজ করেছে। উন্নয়নের অধিক্ষেত্র হিসেবে প্রান্তিক ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠীসমূহকে বেছে নেবার ক্ষেত্রে এই দ্বৈতবাদ মনস্তাত্ত্বিক রসদ সরবরাহ করেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় 'আয়-ব্যয় হিসাবের' চেয়ে দ্বৈতবাদ কম যায় না। 'আয়-ব্যয় হিসাবের' মাধ্যমে যেমন পলিসি বা সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়, তেমনি প্লান্ট বা ক্ষেত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদ সাহায্য করে। উন্নয়নের এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশেও 'প্রতিবেশ-নারীবাদের' একটি পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। 'প্রতিবেশবাদের' লক্ষ্যের দিক থেকে শুধু 'নারী ও প্রতিবেশের' ওপর মানব প্রতিহিংসার চালচিত্রই তুলে ধরে না। বরং আধিপত্যবাদী, শোষণবাদী, লিঙ্গবাদী এবং বর্ণবাদী চরিত্র উন্মোচনের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি একটি 'কৌশল' হিসেবেও কাজ করে। দুর্বল এবং সবল এই দ্বি-সত্তাকে বোঝার মধ্য দিয়ে সামাজিক শোষণ ত্বরান্বিত হয়। শোষণের এই মাত্রায় শুধু যে শ্রেণি-শোষণ কার্যকর হয় তা-ই নয়, বরং শ্রেণি-শোষণের পাশাপাশি লিঙ্গগত শোষণের বিষয়টিও রয়েছে। শোষণের আরেকটি কসমোপলিটান চরিত্র হলো 'প্রযুক্তি' তথা 'বিজ্ঞান'। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান এই দুইয়ের ওপর ভর করেই হয় উন্নয়ন। আর জাতি হিসেবে তাদেরকেই উন্নত বিবেচনা করা হয়, যারা বেশিমাত্রায় প্রাকৃতিক সম্পদকে করায়ত্তে আনতে পেরেছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে করায়ত্তে আনার মধ্য দিয়ে বস্তুত পরিবেশ-প্রকৃতির বিনাশকেই উদ্বোধন করা হয়। তাহলে আধিপত্যের লক্ষ্য হলো শোষণ, শোষণের ক্ষেত্র হলো 'সমাজ, শ্রেণি, নারী ও পরিবেশ-প্রকৃতি'। প্রতিবেশ-নারীবাদ শোষণের এই বহুমাত্রিক প্রকাশগুলোর চরিত্র উন্মোচন করার দর্শনও বটে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য 'ইকোপার্ক উন্নয়নের' প্রকল্পটি প্রতিবেশবাদী গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম বিনষ্ট করা হচ্ছে সে এলাকার ভেষজ উদ্ভিদসমূহ। এই উদ্ভিদ বিনাশের কারণে ধ্বংস হচ্ছে সেখানকার প্রাণবৈচিত্র্য। বিখ্যাত পরিবেশতাত্ত্বিক বেরি কমোনারের পরিবেশ বিষয়ক নীতির প্রথম নীতিটির কথা এ প্রসঙ্গে উলে-খ করা যেতে পারে, 'সবকিছুই অন্যকিছুর সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত'। পরিবেশ বিষয়ক এই নীতিটি মূলত মধুপুরের শালবনের আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। একজন গবেষকের লেখা থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে : 'মধুপুর শালবনের অধিকাংশ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করা হয়েছে। কলা, আনারস ও বিদেশি বা আগ্রাসী প্রজাতির দৌরাত্ম্য পুরো এলাকা জুড়ে। তারপরও যেটুকু জায়গায় এখনো এসবের আগ্রাসন হয় নি সেখানে শালবনের শত শত প্রজাতি কীভাবে বাঁচার চেষ্টা করছে এ জায়গাটি তারই উদাহরণ।'[১১] একজন জাতি-উদ্ভিদ গবেষকের সূত্র থেকে গাইন উল্লেখ করছেন, "এখনো যেখানে শাল কপিস আছে, কেবল সেখানেই উদ্ভিদ ও প্রাণবৈচিত্র্য আছে। যেসব জায়গায় কলা, আনারস ও আগ্রাসী প্রজাতির বাগান হয়েছে সেখানে প্রাণবৈচিত্র্য একেবারে নেই"।[১২]

আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খেয়ে বেড়ে ওঠে উদ্ভিদ এবং এসব উদ্ভিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'প্রাণবৈচিত্র্য'। কিন্তু উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রের বন-আগ্রাসন নীতি একদিকে আমাদের প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্যকে যেমন ধ্বংস করছে, অন্যদিকে এই প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্যের মধ্যে

বসবাসকারী নৃ-জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক নির্মাণসমূহ অবলুপ্ত হচ্ছে। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অরণ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। ইকোপার্ক প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসী সংস্কৃতি থেকে অরণ্য হারিয়ে যাচ্ছে। ইকোপার্ক প্রকল্প নারীবাদী ইস্যুও। মধুপুরসহ সারাদেশের ইকোপার্ক প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ ধ্বংসের বিশাল আয়োজন যেমন সম্পন্ন হচ্ছে, তেমনি বনবাসী সহজ-সরল নারীর ধর্ষিত হবার ঘটনার মধ্য দিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তোলা হচ্ছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের ইকোপার্ক উন্নয়ন প্রচেষ্টাটি একাধারে প্রতিবেশবাদী ইস্যু। ইকোপার্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দুটি নগ্ন তৎপরতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে : এক আদিবাসীর বনজ-ভূমিকে জবরদখল করার মাধ্যমে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করা, দুই. ভু-প্রকৃতি ও বনজ-প্রকৃতিকে ধ্বংস করা। এই উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম বিনষ্ট করা হচ্ছে সে এলাকার ভেষজ উদ্ভিদসমূহ। উদ্ভিদ বিনাশের কারণে ধ্বংস হচ্ছে সেখানকার প্রাণবৈচিত্র্য। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অরণ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। ইকোপার্ক প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসী সংস্কৃতি থেকে অরণ্য হারিয়ে যাচ্ছে। আর এভাবে ইকোপার্ক উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি পরিবেশবাদী ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ পর্যন্ত যে ইকোপার্কসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তন্মধ্যে মধুপুর ইকোপার্ক, মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক এবং চিম্বুক ইকোপার্ক গুরুত্বপূর্ণ। মধুপুর বিস্তীতৃর্ণ বনভূমির ৭০ ভাগই শাল। শাল ঐ এলাকার ভূ-বৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং মুধুপুর কিংবা তদসংলগ্ন এলাকার মাটি শালবৃক্ষের জন্য উপযোগী। শালের পাতা পচে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। উর্বর ভূমিতে আবার গজিয়ে উঠে শালকপিস। শালবনে শালের সঙ্গে বেড়ে উঠে চম্বল, সিধা, আমলকি, সাজনা, কালস, কড়ই, গাওগিলা এবং আজুলি বৃক্ষ। ১৯৫০ সালে 'The State Acquisition and Tenancy Act of 1950' এর মাধ্যমে ময়মসিংহ এবং সিলেট এলাকার বিশাল বনজ এলাকাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অ্যাক্টের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ আরো পাকাপোক্ত হয়ে উঠে। এভাবেই অ-পরিবেশবাদী বননীতি সমকালীন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় লোকায়ত পরিবেশ অবস্থাকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি ঠেলে দিয়েছে।

৪.২ ইকোপার্ক উন্নয়ন ও SEA এবং EIA

সমকালীন পরিবেশবাদী তত্ত্বের বিকাশের ফলে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিবেশ সম্মত কি-না তি নির্ধারণের জন্য বেশ কয়েকটি কৌশল ব্যবহার করা হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

ক. এসইএ (Strategic Environmental Assessment)

খ. ইআইএ (Environmental Impact Assessment)

সিইএ এবং ইআইএ উভয়ের লক্ষ্য পরিবেশ, অর্থনীতি, সামাজিক ইস্যু এবং ধারণযোগ্য উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। ইআইএ (EIA) এর জন্য এসইএ (SEA) খুবই জরুরী। নিচের ডায়াগ্রামে তা দেখানো হলো:

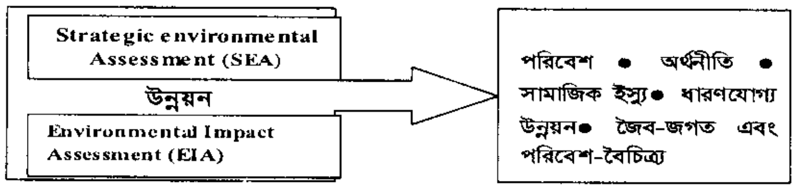

ডায়াগ্রাম ৫ : SEA ও EIA এর লক্ষ্য

SEA এবং EIA উভয়ের মধ্যে সাধারণ কতগুলো শর্ত রয়েছে যা কোনো পলিসি বা প্ল্যান গ্রহণের সময় বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ইকোপার্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ দুটি কৌশলকে গৌণ করে দেখা হয়েছে। SEA এবং EIA এর লক্ষ্য যেখানে উন্নয়ন পলিসি গ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিকসমূহকে প্রাধান্য দেওয়া সেক্ষেত্রে কোনোটিকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। উপর্যুক্ত দুটি কৌশল ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব ইকোপার্ক উন্নয়ন কিভাবে পরিবেশগত বাস্তবতাকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি ঠেলে দিয়েছে।

৪.৩. বাংলাদেশের ইকোপার্ক উন্নয়ন : এসইএ (Strategic environmental Assesment) মূল্যায়ন

বাংলাদেশে ইকোপার্ক উন্নয়নের নামে বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা ইতোমধ্যে সফলতা অর্জন করেছে। মধুপুর ইকোপার্ক, চিম্বুক ইকোপার্ক এবং মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সরকারের সফলতার পাল্লা বাড়লেও সেখানকার পরিবেশ বিপর্যয় গবেষকদের দৃষ্টি এড়ায় নি। সেখানকার পরিবেশ বিপর্যয়ের স্বরূপটি দেখার পূর্বে আমরা জেনে নেব 'এসইএ' কী? কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিবেশের জন্য কতোটুকু ক্ষতিকর, কিংবা কোন ফ্যাক্টরসমূহের উপস্থিতি পরিবেশ-বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে তা বিবেচনায় রেখে নীতিনির্ধারণে কৌশল প্রণয়ন করাই 'এসইএ' এর ভূমিকা। 'এসইএ' গৃহীত ইফেক্টিভ নীতিমালাসমূহ লক্ষ করা যাক:

১. যে কোনো প্রস্তাবিত পলিসি বা নীতির বা পরিকল্পনা বা পোগ্রামের পরিবেশগত প্রভাব কী তা বিবেচনায় রাখতে হবে।

২. যে কোনো উন্নয়নের সময় নীতিনির্ধারকদের 'এসইএ' এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৩. 'এসইএ' কে অবশ্যই নীতিনির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে হবে।

৪. 'এসইএ' পরিবেশগত প্রভাবসমূহ নির্ণয়ে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রয়োগযোগ্য পরিবেশ নীতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

৫. পলিসি বা প্লানের যৌক্তিকতা কিংবা এর গঠন-কাঠামো কি রকম হবে তা অবশ্যই প্রক্রিয়ামফিক হতে হবে।

৬. যে গোষ্ঠীকে লক্ষ রেখে উন্নয়ন করা হয় সে গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে যেন গৃহীত পলিসি যুৎসই হয়।

৭. আমাদেরকে অবশ্যই আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ কৌশলটি অনুসরণ করতে হবে, এতে করে গৃহীত পলিসিটি একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হবে ।

৮. সিদান্ত-প্রণয়নকারীগণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যগত প্রভাবসমূহ যাচাই করে দেখবেন ।

সর্বোপরি 'এসইএ' থেকে যে সুফলসমূহ আমরা পেতে পারি তা নিচের ডায়াগ্রামে দেখানো যেতে পারে :

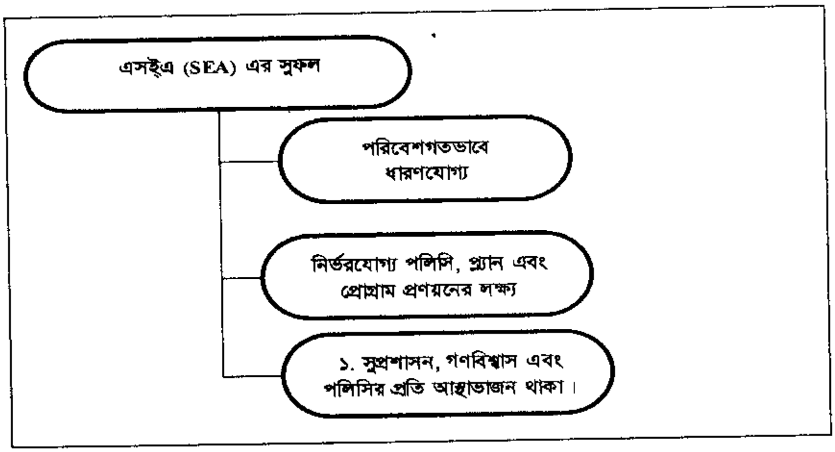

ডায়াগ্রাম ৬ : এসইএ (SEA) এর লক্ষ্য

জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, ইকোপার্কের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা । কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে ভিন্ন প্রতিচিত্র । মধুপুর ইকোপার্ক উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবাহিনী এবং ইকোপার্ক উন্নয়নের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহ প্রতিশ্রুত দুটি শর্তকেই পাশকেটে গিয়েছে ।

৪.৩.(ক). মধুপুর ইকোপার্ক : ১৭ জুলাই ২০০০ সালে উডলটে অংশগ্রহণকারী ১৬৪ জনের স্বাক্ষরিত তৎকালীন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে লেখা আবেদন পত্রটির[১৩] সারমর্ম বিশ্লেষণ করলেই মধুপুর ইকোপার্কের SEA এবং EIA লঙ্ঘনের চিত্রটি পাওয়া যাবে:

- আবেদনকারীগণ উল্লেখ করছেন মধুপুর বন উন্নয়নের নামে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে যে 'সামাজিক বনায়নের' পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাতে বন এলাকার গারো, কোচ এবং বাঙালিদের অনেকেরই অংশীদার হবার কথা । বনবিভাগের সঙ্গে চুক্তি হবার ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী যাদেরকে উডলটে অংশীদার করা হয়েছে তারা বাগান রক্ষা করবে, সাত বছর পর গাছ বিক্রি করে যে আয় হবে তার ৪০ শতাংশ তারা পাবে । প্রকল্প শুরু করার সময় বনবিভাগ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই চুক্তি হলেও পরবর্তী সময় তাদেরকে বনের অংশীদারিত্বের প্রশ্নে কোনো সুযোগ দেওয়া হয় নি । যা আন্তর্জাতিক সামাজিক বনায়ন এবং ইকোপার্ক উন্নয়ন নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ।

- বনায়নের শর্ত হিসাবে চুক্তিতে শালকপিসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও শেষতক দেখা যায় রাক্ষুসী-প্রজাতির উদ্ভিদ ইউক্যালিপটাস, আকাশিয়া, কলা, আনারস-এরকম উদ্ভিদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এসব উদ্ভিদ দ্রুত-বর্ধনশীল হলেও পরিবেশের জন্য, সে এলাকার ভু-বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর।
- বনের উপর থেকে সে এলাকার মানুষের নিয়ন্ত্রণ কমে যাবার ফলে অবাধে সেখানে বৃক্ষ-নিধন হচ্ছে, পুলিশ এবং কাঠব্যবসায়ীদের যোগসাজশে কাঠ চুরি ও লুটপাট হচ্ছে। আর এসবের সঙ্গে বনবিভাগের অসাধু কর্মচারী এবং কর্মকর্তারা নিজেদের আড়াল করার জন্য স্থানীয়দের হয়রানির করার জন্য মিথ্যা-মামলা দিয়ে হয়রানি করছে।

উপর্যুক্ত আবেদনে যে বিষয়সমূহ গুরুত্ব পেয়েছে তার সব কয়টিই SEA এবং EIA এর নীতিসমূহের লঙ্ঘন বলা যায়। কারণ এ দুটি কৌশলই দাবি করে : পলিসি গ্রহণের সময় অংশীদারদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠী সুবিধার দিকটিকে বিবেচনায় রাখা। আর পরিবেশ-বান্ধব ভুমিকাকে অবশ্যই গুরুত্ব দেবার কথা বলা হয়। কিন্তু উপর্যুক্ত আবেদনের বক্তব্য তেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি মধুপুর ইকোপার্ক কিংবা সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে SEA এবং EIA এর শর্তসমূহ অনুসরণ করা হয় নি।

৪.৩.(খ). মৌলভীবাজার ইকোপার্ক : মৌলভীবাজারে ইকোপার্ক করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সে এলাকার খাসিয়া এবং গারো জনগোষ্ঠী ব্যাপক প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদের কারণ দুটি : স্বীয় আবাসভূমি থেকে বিতারিত না হবার এবং ভুমি, বন এবং প্রকৃতির উপর তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না করার। কিন্তু মৌলভীবাজার মাধবকুণ্ডু-মুরাইছড়া ইকোপার্কের বিরুদ্ধে সে এলাকার আদিবাসীদের আন্দোলন সংগ্রাম প্রমাণ করে পলিসি গ্রহণকারী আধিকারিকগণ স্থানীয় জনগণের ন্যায্য দাবিকে মোটেই আমল দেয় নি। এখানে আমরা স্পষ্টত SEA এবং EIA -এর শর্তসমূহের ব্যত্যয় লক্ষ করি।

তাছাড়াও আমরা লক্ষ করে দেখব ২০০০ সালের জাতিসংঘের পর্যটন কমিশনের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত, ইউএনইপি'র ট্যুরিজম গাইড এবং কানাডার কুইবেকেব ঘোষণার পরিপন্থি। ১৯-২০ মে ২০০২ সালে কানাডার কুইবেকে অনুষ্ঠিত সামিটে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ-সবমিলিয়ে আমাদের ইকোপার্কে এসব ঘোষণার কোনোটিই অনুসরণ করা হয় না। নিচের সারণিটি লক্ষ্য করা যাক :

বাংলাদেশ ইকোপার্ক	ইউএনইপি ঘোষণা	মন্তব্য
	নীতি-ক : যেকোনো পরিকল্পনায় বা নীতি গ্রহণের সময় প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সক্রিয় থাকা।	বাংলাদেশের অধিকাংশ ইকোপার্কসমূহ নীতি-ক এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হয় নি। আমরা লক্ষ করে দেখব অধিকাংশ পর্যটন কেন্দ্র কিংবা ইকোপার্কসমূহের অবস্থান আতিবাসী অধ্যুসিত এলাকায়, কিন্তু আদিবাসীদের যে প্রাকৃতিক চিন্তা-চেতনা রয়েছে, তাদের প্রকৃতিবাদী জীবনাচারের সঙ্গে যে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বোধ-উপলব্ধি বিদ্যমান তার কোনোটিকেই এসব উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। পাহাড়ি আবিাসীদের জীবন-সংস্কৃতির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তাদের 'জুম-কৃষি সংস্কৃতি'। কোনো প্রকার নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই পাহাড় কাটা, বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী ধ্বংস করা – সবই হচ্ছে ইকোপার্কের নামে কোথাও - বা সামাজিক-সংস্কৃতির নামে।

সারণি ৭: ইউএনইপি নীতি-ক ও বাংলাদেশ ইকোপার্ক

বাংলাদেশ ইকোপার্ক	ইউএনইপি ঘোষণা	মন্তব্য
	নীতি-খ : পর্যটন উন্নয়নে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সম্মতি বা অসম্মতির অধিকার	মধুপুর, মৌলভীবাজর, চিম্বুক এলাকায় স্থানীয় এলকাবাসীর ইকোপার্কেও বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংগ্রাম গড়ে তোলা। ইকোপার্কসমূহ প্রতিষ্ঠার সময় স্থানীয় লোকজনের ভুমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ইকোপার্ক বিরোধী আন্দোলনে সংখ্যাধিক এলাকাবাসীর হত্যাকাণ্ড সেই এলাকার জনগণের সম্মতি দেবার বিষয়টিকে যে গ্রাহ্য করা হয় নি সেটাই তার প্রমাণ।

সারণি ৭ : ইউএনইপি নীতি-খ ও বাংলাদেশ ইকোপার্ক

বাংলাদেশ ইকোপার্ক	ইউএনইপি ঘোষণা	মন্তব্য
	নীতি-গ : স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভুমি, এলাকার মধ্যে পর্যটন-শিল্প বা ইকোপার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ, সক্রিয় ভুমিকা নিশ্চিত করতে হবে।	বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের নামে গড়ে উঠা ইকোপার্কসমূহ কিংবা কোনো পর্যটন কেন্দ্রে সে এলাকার স্থানীয় লোকদের কোনো ভুমিকা নেই।

সারণি ৮ : ইউএনপি ঘোষণা

উপর্যুক্ত তিনটি সারণিই দেখাচ্ছে পর্যটন শিল্পের নামে, কিংবা গবেষণা ও প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্যের নামে গড়ে উঠা ইকোপার্কসমূহ কোনোটাতেই আন্তর্জাতিক বিধি বা রীতি ন্যূনতম অনুসরণ করা হচ্ছে না।

৫.০ উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশে ইকোপার্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দুটি নেতিবাচক তৎপরতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে : এক আদিবাসীর বনজ-ভুমিকে জবরদখল করার মাধ্যমে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করা। দুই. ভু-প্রকৃতি ও বনজ-প্রকৃতিকে ধ্বংস করা। এই উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম বিনষ্ট করা হচ্ছে সে এলাকার ভেষজ উদ্ভিদসমূহ। উদ্ভিদ বিনাশের কারণে ধ্বংস হচ্ছে সেখানকার প্রাণবৈচিত্র্য। একজন গবেষকের লেখা থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে : 'মধুপুর শালবনের অধিকাংশ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করা হয়েছে। কলা, আনারস ও বিদেশি বা আগ্রাসী প্রজাতির দৌরাত্ম্য পুরো এলাকা জুড়ে। তারপরও যেটুকু জায়গায় এখনো এসবের আগ্রাসন হয় নি সেখানে শালবনের শত শত প্রজাতি কিভাবে বাঁচার চেষ্টা করছে এ জায়গাটি তারই উদাহরণ।' একজন জাতি-উদ্ভিদ গবেষকের সূত্র থেকে ফিলিপ গাইন উল্লেখ করছেন, 'এখনো যেখানে শাল কপিস আছে, কেবল সেখানেই উদ্ভিদ ও প্রাণবৈচিত্র্য আছে। যেসব জায়গায় কলা, আনারস ও আগ্রাসী প্রজাতির বাগান হয়েছে সেখানে প্রাণবৈচিত্র্য একেবারে নেই'। আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খেয়ে বেড়ে ওঠে উদ্ভিদ এবং এসব উদ্ভিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'প্রাণবৈচিত্র্য'। কিন্তু উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রের বন-আগ্রাসন নীতি একদিকে আদিবাসী এলাকার প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করছে,

অন্যদিকে এই প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্যের মধ্যে বসবাসকারী নৃ-জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক নির্মাণসমূহ অবলুপ্ত হচ্ছে। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অরণ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। ইকোপার্ক প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসী সংস্কৃতি থেকে অরণ্য হারিয়ে যাচ্ছে। আর এভাবে ইকোপার্ক উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি পরিবেশবাদী ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম বাস্তবতায় ইকোপার্ক উন্নয়নে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন, অন্যদিকে স্থানীয় জ্ঞানিক মাত্রাকে ইকোপার্ক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। সুতরাং এ প্রসঙ্গে আমাদের পরামর্শ হলো: ১. ইকোপার্ক উন্নয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি ঐ জনগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করা। ২. SEA এবং EIA -এর শর্তসমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন, ৩. এসব শর্তসমূহের পাশাপাশি নিম্নোক্ত কাঠামো অনুসারে ইকোপার্ক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করলে তা পরিবেশবাদী দাবির পাশপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে।

ইকোপার্ক ও ইকোট্যুরিজমের এই সম্পর্ককে আমরা এভাবে দেখতে পারি।

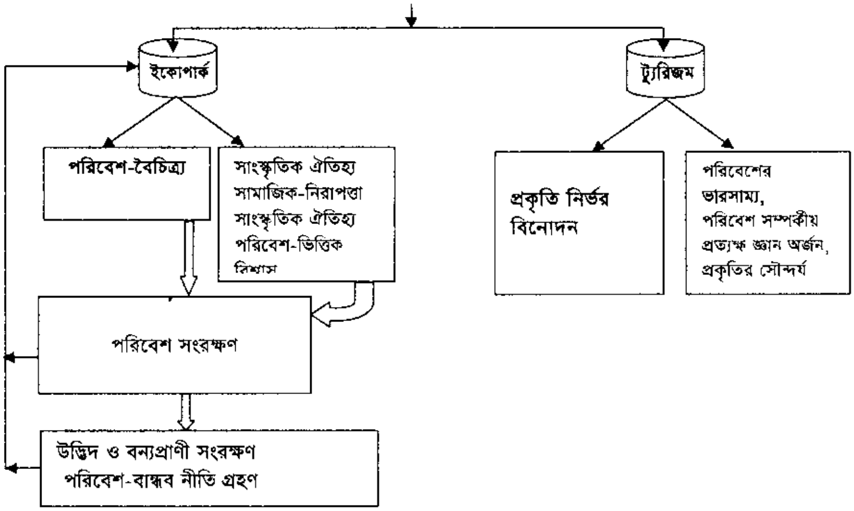

ডায়াগ্রাম ৭ : ইকোপার্কের প্রকৃতি

তথ্যসূত্র

১. Report on "Sustainable Tourism", The Berlin Declaration on Biological Diversity and Sustainable Tourism", International Conference of Environment Ministers on Biodiversity and Tourism 6-8 March, 1997. Berlin, German.

২. 2. Ibid. 1997, Berlin, German.

৩. Przeclawski, K. Deontology of tourism. In C. Cooper and S. Wanhill (eds) Tourism Development: Environmental and Community Issues , 1997, pp. 105.

৪. Budowski, T. Ecotourism Costa Rican style. In V. Barzetti and Y. Rovinski (eds) Toward a Green Central America: Integrating Conservation and Development. Panos Institute, 1992.

৫. Przeclawski, K. op.cit., 1997, pp. 105.

৬. Nelson, J.G. The spread of ecotourism: Some planning implications. Environmental Conservation 21 (3), 1994, 248-255.

৭. ইকোপার্ক সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত তথ্যাদি দেখুন, মেহদী, মুজিব, ইকোপার্ক উন্নয়ন : জীববৈচিত্র্য বার নামে জীবন ও প্রতিবেশ বিনাশী তাণ্ডব, ইনস্টিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট, ২০০৫.

৮. Rajat Kanti Goswami, Foundation of "controversial", Eco-park to be laid today, The Daily Star, Dated, 14-04-2001.

৯. মেহদী, মুজিব "স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাপন ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ইকোপার্কের তিকর প্রভাব" ইকোপার্ক উন্নয়ন : জীববৈচিত্র্য রার নামে জীবন ও প্রতিবেশ বিনাশী তাণ্ডব, আইইডি ও এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৫ ।

১০. মেহদী, মুজিব, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮ । গবেষক উদ্ধৃতি নিয়েছেন খান, হাফিজ রশিদ সম্পাদিত বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী : অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত নামক প্রকাশনায় মুদ্রিত রাজা দেবাশীষ রায়ের প্রবন্ধ 'পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূমি সমস্যার স্বরূপ' থেকে, অক্টোবর ১৯৯৩ ।

১১. গাইন, ফিলিপ, বাংলাদেশের বিপন্ন বন, সেড, লালমাটিয়া, ঢাকা, ২০০৫, পৃ.৯ ।

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৩ ।

১৩. গাইন, ফিলিপ (সম্পাদিত), বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম, সেড, লালমাটিয়া, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৫৩.

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
ঊনচত্বারিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৬/জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

Concept of Human Resource Information System (HRIS) Structure, Uses and Limitations

Md. Sanwar Jahan Bhuiyan *

Abstract: *A properly developed information system is an immense requirement to get useful information by the HR managers for making effective decisions in organization. In changing situations of the competitive market, it is a vital challenge for the apex management to take correct decision considering anticipated changes of both the external and internal environment of the organization. The success of the management now-a-days fully depends on efficient utilization of all sorts of resources specially the most critical resource of the organization that is human resource. But an information system like HRIS is the most pertinent source of information that provides necessary inputs regarding recruitment, placement, training & development, career management, productivity and performance management by which the management strives to have the right number and the right kind of people at the right place, at the right time, to do things which result in, both, the organization and the individual receiving the maximum long range benefit. In this paper, attempts were taken to analyze structure, different approaches of developing an HRIS; its uses and limitations. Systems and software development areas are not discussed here rather conceptual and theoretical framework of an HRIS is discussed elaborately.*

1.0 Backdrop

An information system is one, which is capable of storing and updating data, analyzing, retrieving and disseminating information. Therefore, it is understood that an information system would be comprehensive in holding all sorts of possible information and make those information available and useful for all sorts of prospective and respective users.

Now, about human resource information system, it can be relevantly commented that it is a system composed of HR related information. This HR information involves any qualitative or quantitative information concerning the size or characteristics of human resource or any parts of organization, the way it or any part of it functions. It also relates the employment opportunities available to those who are parts of it and their related interventions and aspirations, and which is pertinent to an understanding of signification hands or critical problems in the HR functions and the formulation of policies and programmes for resolving such problems.

* Deputy Director, Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar, Dhaka.

An efficient human resource information system is considered as an important tool to support the activities of decision makers and planners related to human resources of the organization. This calls for availability of reliable, comprehensive and up-to-date information for the purpose of analysing and assessing the changing HR situation, including the needs for the labour market. An effective human resource information system is equally valuable to individual employers and the private sector for assisting them in preparing employment plans for their organisation. Similarly, an efficient human resource information system is also useful for the workers and employers' organisation so that valuable information can be obtained regarding wage differentiates compensation matters, service condition and training needs. In broader sense, the human resource information system is the store-house of timely, reliable and useful information which can render and generate information according to the need of different types of users.

2.0 Objectives of the Paper

The main objective of the paper is to develop a theoretical structure of Human Resource Information System of an organization, and the specific objectives are as follows:

i) to examine different structures of an Human Resource Information System for collecting, analyzing and interpreting information on HR issues;

ii) to analyze related sub-systems for HRIS and their uses in decision making process in organization;

iii) to identify limitations and prospects for implementing HRIS in public organizations of Bangaldesh.

3.0 Methodology of the Study

The paper is an outcome of rigorous desk study and empirical analysis of related literatures. Gathered experience from some HRIS of public-private organizations visited earlier has been shared in this paper.

4.0 Conceptual Steps of Development of an HRIS

Human Resource Information System is a multi-pronged approach. It is an inter-related and complex system which is able to collect, process, preserve, analyze, retrieve and disseminate information for decision making related to personnel matters. Developing HRIS is a complex.

comprehensive and professional exercise. A successful development of HRIS is completely depend on logical sequences of the steps, strategic needs of the organization and anticipating changes of the HR areas in organization.

The steps of developing an HRIS for a well-organized organization are described below:

1) To determine the objectives of HRIS
2) To determine the scope and coverage of the system.
3) To identify the data and information, which is needed for the particular information system.
4) To select the sources and approaches for collecting information.
   a. Identifying the sources of personal data like personal files, CVs, resumés etc.
   b. Selecting approaches for collecting data like tracer approach, personnel survey etc.
   c. Selecting and collecting published reports and returns of the organization as the sources of info;
   d. Other sources.
5) To develop a software system with the help of system analyst considering output needed.
6) To develop necessary sub-systems.
7) To establish Central Data Bank with necessary IT infrastructure and technical manpower.
8) To establish data revising period and other retrieving method: determining periodic order of the information.
9) To establish electronic information dissemination system
   a. WEB PAGE/WEBSITE
   b. NETWORKING
   c. INTRANET

5.0 Approaches to Development of HRIS

For developing an HRIS, it is very much relevant to select a correct approach. Two types of approaches are available in Management

Information System and one of them to be selected for development of HRIS considering the strengths and weaknesses of the organization concerned. For strong and well-structured organization where users' proficiency is high can follow the Traditional System Development Life Cycle Approach. It is the approach, where every stage of development is deliverable and well-defined. At the time of development of the system, involvement of the users and managers is very intensive and highest. In this approach, both the management and developer have a duty to verify time to time the needs and outputs of the desired system.

Another system development approach is called Prototype System Development Approach which is developed as a Model System for the organization and then the working prototype is being developed gradually by the developer as per needs of the organization.

6.0 Stages of the Application System Development Life Cycle

It is imperative to select a suitable approach for developing PMIS for an organization. For a well structured organization, Traditional System Development Life Cycle Approach is appropriate one. It is a computer based micro system; sometimes it is seen as a sub-system of Human Resource Information System (HRIS). The organization can follow the Traditional System Development Life Cycle Approach when preparedness of the organization is upto the mark and management's attitude is pro-ICT. The stages of the Application System Development Life Cycle are described below:

a. Definition Stage

- i. Proposal Definition
- ii. Feasibility Assessment
- iii. Information Requirement Analysis
- iv. Conceptual design

b. Development Stage

- i. Physical System design
- ii. Physical Data Base Design
- iii. Programme Development
- iv. Procedure Development

c. Installation and Operation Stage

i. Conversion

ii. Trail Run of the System

iii. Operation and Maintenance

iv. Post Audit

Flow Chart of Development of an Application System Development Life Cycle

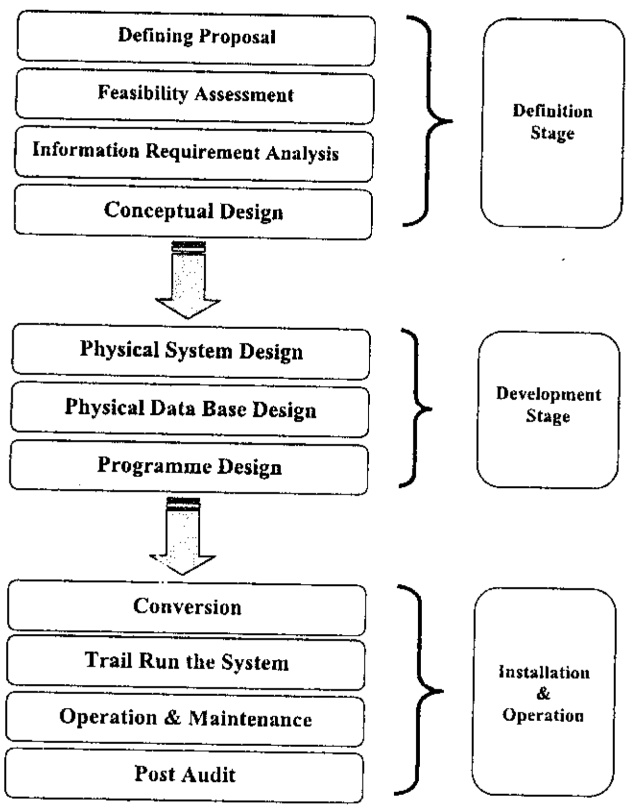

7.0 Byars and Rue Model for HRIS

HRIS is usually a part of the organization's larger management information system (MIS). It can be developed either by manually or by computerization. But computerization has its own advantage of providing more accurate and timely data for decision making. There are one more

approaches and techniques for system development. An approach of developing HRIS is described elaborately by Loyal L. Byars and Lesile W. Rue (1984) in their book named Human Resource Management. The authors described 14 steps in developing the system. An adapted form of the approach is outlined below where the specific procedures in developing and implementing an HRIS are described elaborately.

Step 1: *Inception of Idea*

The idea for having a HRIS must originate somewhere. The originator of the idea should prepare a preliminary report showing the need for a HRIS and what it can do for the organization.

Step 2: *Feasibility Study*

Feasibility study evaluates the present system and details the benefit of a HRIS including cost benefit analysis and efficiency-effectiveness of the desired output.

Step 3: *Selecting a Project Team*

Once the feasibility study has been accepted and the resources allocated, a project team should be selected. The project team consist of an HR representative who is knowledgeable about the organization's personnel functions and activities and about the organization itself and representative both management information systems and payroll. As the project progresses, additional clerical people from the HR Department can be included.

Step 4: *Defining the Requirements*

A statement of requirements specifies in detailed exactly what the HRIS will do. A large part of the statement of requirements normally deals with the reports that will be produced. Naturally, the statement also describes other specific requirements. This typically includes written descriptions of how users collect and prepare data, obtain approvals, complete forms, retrieve data and perform other non-technical task associated with HRIS use. The key here is to make sure that the mission of the HRIS truly matches management need for a HRIS.

Step 5: *Vendor Analysis*

This step determines what hardware and software are available that will meet the organization's actual need for the lowest price. This is a difficult task. The best approach is usually not to ask vendors if a particular

package can meet the organization's requirement but how it will meet those requirements. The result of this analysis will determine whether to purchase and 'off-the-shelf' package or develop the system internally.

Step-6: *Package Contract Negotiation*

After a vendor has been selected, the contract must be negotiated. The contract stipulates the vendor's responsibilities with regard to software, system development, installation, service, maintenance, training and documentation.

Step-7: *Training*

Training usually begins as soon as possible after the contract has been signed. First, the members of the project team are trained to use the HRIS. Towards the end of the implementation, the HR representative will train managers from other departments in how to submit information to the PIS and how to request information from it.

Step 8: *Tailoring the system*

This step involves making changes to the system to best feed the needs of the organization. A general rule of thumbs is not to modify the vendor's package, because modifications frequently cause problems. An alternative approach is to develop programs that augment the vendor's programes rather than altering it.

Step-9: *Collecting the data*

Prior to start-up of the system, data must be collected and entered into the system.

Step 10: *Testing the system*

Once the system has been tailor to the organization's needs and the data entered, a period of testing follows. The purpose of the testing phase is to verify the output of the HRIS and to make sure it is doing what it is supposed to do. All reports should be critically analyzed for accuracy.

Step-11: *Starting up*

Start-up begins when all the current actions are put into the system and reports are produced. It is wise to attempt start-up during a full period so that maximum possible time can be devoted to the HRIS. Even though the system has been tested, some additional errors often surface during start-up.

Step-12: *Running in parallel*

Even after the new HRIS has been tested; it is desirable to run the new system in parallel with the old system for a period of time. This allows for the comparison of outputs of both the system and examination of any inaccuracies.

Step-13: *Maintenance*

It normally takes several weeks or even months for HR people to feel comfortable with the new system. During this stabilization period, any remaining errors and adjustment should be handled.

Step-14: *Evaluation*

After the HRIS has been in place for a reasonable length of time, the system should be evaluated. It is HRIS right for the organization and it is being properly used.

8.0 Development of Input Modules for HRIS

Development of HRIS is a technical exercise. It is important to determine the desired out put from the system at the very beginning of the exercise. The desired out put will give clue what would be the correct input to have the desired out come of the system. The data inputs may be qualitative and quantitative or both. Possible sub-systems within the system can be outlined before starting the development of the system. For building a good and effective sub-system some additional input may be required. The input data and information will be on personal data, recruitment data, job history, performance data, training and development data, accounting data and miscellaneous data.

The details Modules on above areas are described below:

Module-1: Personal Data

Name of the employee

Father's name

Mother's name

Marital status

Family History

Date of Birth

ID no

Batch no

Name of Cadre

Addresses

Module-2: Recruitment History

Date of joining

Date of Encaderment

Date of Confirmation

Serial no in combined gradation list

Position in Batch

Job preference

Module-3: Job History

Placement data

Transfer data/ deputation data/ lien data

Prior Experience

Jobs, performed earlier in different positions

Data on skills and specializations

Module-4: Performance Data

Numbers of ACR

Comments of Controlling/Reporting officers

Names and ID numbers of RIOs/CSOs

Job wise performance records

Reward for outstanding performance

Adverse comments (if any)

Average PA position on last 3 years

Module-5: Training & Development

Educational Attainments

Technical Qualifications

Titles, Durations, Institutions of Trainings

Performance in Trngs: Grade, Number, Position

Info of Foreign Training

Training requirements etc.

Module-6: Accounting Data

Salary grade

Basic Scale

Per annum increment

House allowance

Medical allowance

Training allowance

Conveyance allowance

GROSS SALARY

Income Tax deduction

Benevolent fund deduction

Group insurance deduction

House Loan deduction

Car loan deduction etc

DRAWING AMOUNT

Module-7: Miscellaneous Data

Departmental Proceeding (if any)

Data of Fringe Benefit

Data on Compensation

Health Status

Serious Bad Habits

Extra Curricular Activities

9.0 Development of HRIS and Related Sub-Systems

The System must have required number of subsystems. Since an HRIS is a tool for managerial decision-making, it must have a focus on various sub-systems. The inbuilt subsystem of the HRIS will be able to provide useful information for taking decision on selection and recruitment.

training and development, career planning, payroll management and human resource planning for the organization.

A Flow Chart of Human Resource Information System

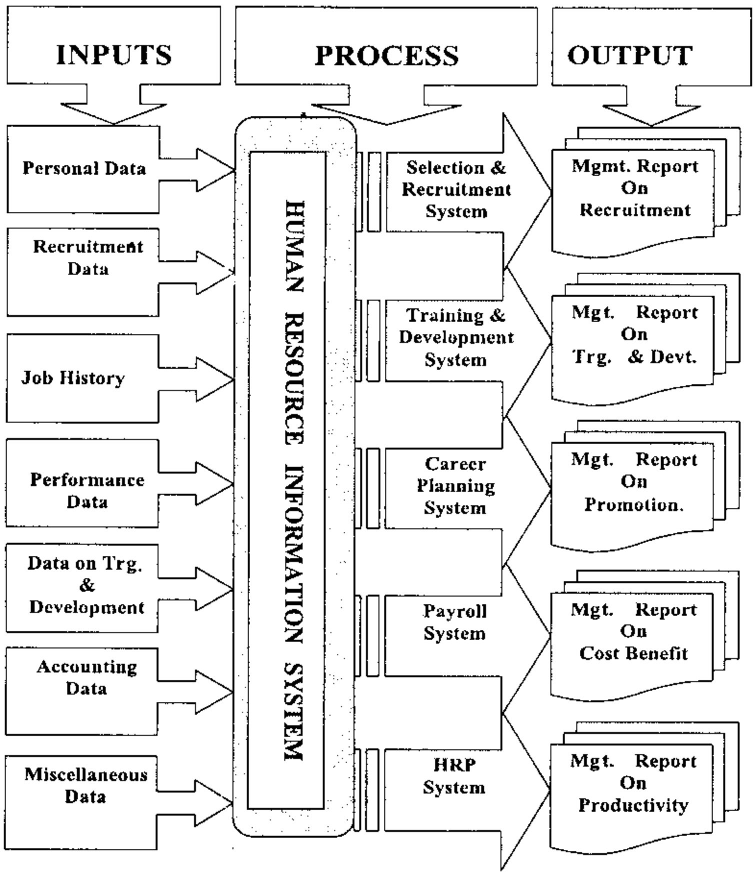

Under the proposed HRIS, the following sub-systems may be incorporated:

a. Selection & Recruitment Sub-system

b. Training & development Sub-system

c. Promotion Sub-system

d. Performance Appraisal Sub-system

e. Career Planning Sub-system

f. Productivity Sub-system

10. Desired Outputs

It is pertinent to have an idea of desired out put from the HRIS. From the HRIS. it is possible to have some important managerial reports and returns which may assist the managers of strategic level to take operational and strategic decision for the organization. To have the desired out puts in the form of managerial reports. it is imperative to have sufficient interfaces for the system so that concern parts and related clients can get access to have information and put necessary inputs to the system. These interfaces will be used as important portals of the system under the Intranets and Extranets of the organization. The proposed subsystems of the HRIS are described below:

Proposed Sub-system	Desired Output
Selection & Recruitment Sub-system	» Management reports on recruitment, placement, recruitment needs, attrition and retrenchment rate and trend etc.
Training and Development Sub-system	» Management report on training needs, training information etc. » Report on training performance, training records, list of prospect nominees for net course etc.
Promotion Sub-system	» Management reports on gradation and seniority list, qualification score for promotion, eligibility list of promotion etc.
Performance Appraisal Sub-system	» Management reports on performance targets, performance appraisal, and performance improvement plans etc.
Career Planning Sub-system	» Management reports on career development, career plan, succession plan, individual career prospects etc.
Productivity Sub-system	» Management reports on productivity, individual and team performance etc.

A Flow Chart of the Necessary Interfaces and User's Portals of the HRIS

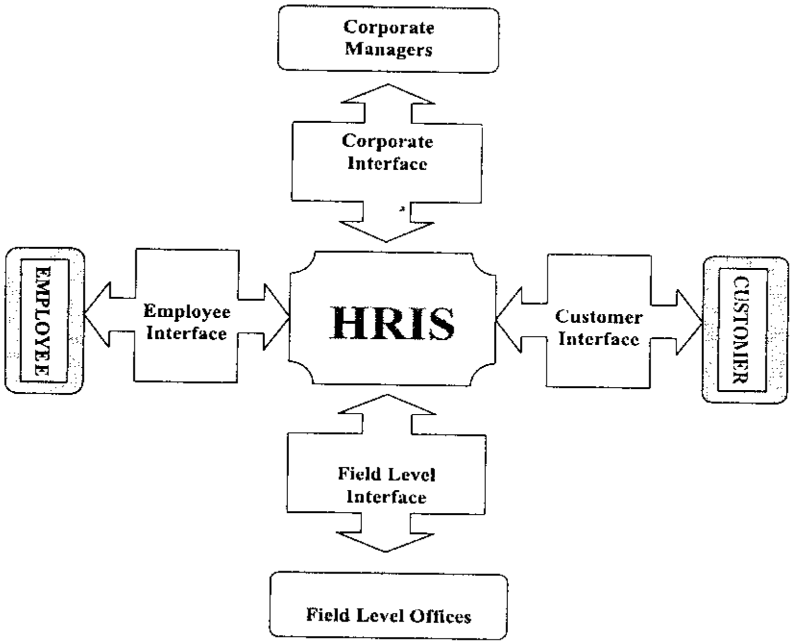

11. Benefits of HRIS

HR managers can get a number of benefits from a well-organized HRIS. It is an important tool for taking HR decisions of day to day and strategic in nature. Nankervis et al. (2002) made an inventory of benefits generally one HR manager can obtain from an HRIS:

a. improve planning and program development using decision support software
b. faster information processing and improved response times
c. decreased administrative and HR costs
d. accuracy of information
e. enhance communication at all levels.

Apart from above mentioned benefits a visionary HR manager can use it as an important tool for planning HR strategically. As Professor Boudreau mentioned:

> *"After all, more than any other resource, the 'human resource' embodies information-based characteristics such as knowledge, skills, capabilities and competencies. Thus, the value of the 'human capital' of organizations, and the method of managing it, depend on understanding and using information".*

Actually, as a strategic tool, HRIS can be used to contribute to formulate, modify and evaluate HR plans, both in terms of qualitative and quantitative.

12. Macro-Micro Level Limitations in Implementation of HRIS in Bangladesh

For preparing HRIS the organization itself and macro level environment should be assessed. To assess preparedness and readiness a professional study must be performed. Without having a favorable ICT condition, the initiative to develop a HRIS and operation of the system must be hampered and sustainability of the system will be under the unforeseen threats. The existing limitations of macro and micro levels are described below:

i. Inadequate ICT Infrastructure within the government offices

In government offices, the use of computers is not up to the mark. Inadequate number of computer that is largely unused and under used in government offices is one of the main problems. Sometimes computer is used as a show piece in the table of a big boss. A few number of government offices have their computers connected with internet. Some government offices and training centres established LAN but due to inadequate number of expert user the LAN is not properly used in government organizations.

ii. Inadequate access to ICT by government officials

In public sector offices, government budgetary provisions are not friendly to procure and acquire ICT. The Computers found in government offices are generally donated by development projects and for its valuable price it was given place on the big table of the big boss. The desk level officers are considered for having access to computers though young officers are more competent and ready to accept new technology. Not only that, incase of nomination of foreign trainings on ICT the senior officers of line management are given priority rather than young professional of staff managerial areas.

iii. Lack of Awareness of government officials about ICT

The main obstacle to develop information system is the backdated mindset of the government officials. Especially the benefits and outcomes of the information systems are being failed to perceive by the senior

government officials. Due to proper knowledge on ICT they are generally failing to forecast the anticipatory needs of information systems. Sometimes the organizations have to face resistance due to the reasons mentioned below:

i. they don't like to change their traditional working methods;
ii. they think computerization may cause a huge redundant of manpower;
iii. they usually ready to perceive a computer only for typing purpose.

iv. Lack of incentive package for government officials

In public sector, there is no special incentive package for IT specialists rather they are considered as like as generalist people. Not only that sometime the generalist officers are shouldering the responsibilities of IT section and lack of knowledge and motivation they are sufficient to destroy all the system of IT establishment.

v. Inadequate training programmes

Since the idea of automation and HRIS are new so it is the only way to disseminate the concept to the users and experts is training. But training proramme is not adequate in terms of period and relevancy. Inappropriate nomination of participants and motivated programmes are the main problems in ICT training. The training components of ICT and other ICT related projects are often neglected or unimplemented by the authority.

vi. Unstable tenure of government officials

Frequent and unpredictable transfers of government officials are the common problems in public sector management. It causes the continuity of ICT projects. When an IT champion transfers from one station, it is found that absence of another competent person the running IT project became abandoned.

vii. Inadequate capacity of human resources

For a country of more than 140.6 million (Statistical Pocket Book 2007 of Bangladesh) people, the number of IT-trained people in the country is meagre with about 1,630 incoming students at public universities, 2,370 at private universities and 1,120 at polytechnics. On top of that, most of the well-trained IT graduates of the country leave since there is a little scope for them in Bangladesh in terms of professional development. There is no well-planned target to develop IT specialist considering

growing expansions and need of this sector.

viii. Failures of PACC

Public Administration Computer Centre is the only Central HR Information System of the country. But the PACC is completely failed to disseminate its functional and organizational philosophy to the micro organizations of the country. The name of the PACC is not correct and it should be modified as Central Human Resource Information System (CHRIS) or Public Administration Information System (PAIS). As a pioneer organization in Public Administration Information System, it should have a rule to prepare model HRIS for public sector organizations.

ix. Failures of Training Institutes

Under the instructions of National Training Council, every training institutes of public sector of the country prepared module on Computer Applications. It is completely skill based and operating packages are the main coverage of the module comprising with Microsoft Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access. Some institutes cover Internet and Websites operation and browsing systems. But for ICT and Information System the training institutes must need to include MIS, E-governance, Office Automation, Intranet, Extranet, LAN, HRIS and E-commerce etc. It is needless to mention that E-governance is, now-a-days, considered as a strong component of good governance. So, all the training institutes of public sector should have a role to develop HR so that they can contribute for developing and operating HRIS effectively. But lack of proper vision and mission of training institutes regarding ICT and MIS, it is not yet possible to create proper skills in these issues.

13. Recommendations

Implementation of HRIS is not a one shot exercise rather it is a strategic option to be taken by the organization. Integration of decision-making process with the HRIS is the most imperative step for the organization and management apex as well. So, better implementation of HRIS in organization depends on pre-planned initiatives of the authority. In this line some strategic recommendations are extracted bellow:

a. Re-orientation of training on ICT

In public sector, training on computer literacy and skills are almost compulsory in core courses. But weakness of the training on computer is

not to give emphasis on MIS, office automation, LAN, intranet or extranet etc. Lack of proper example or demonstration the ideas on enormous potentiality of the MIS or HRIS or office automation or e-Governance is not discussed properly in training session. The training on computer is almost based on operating systems mainly on MS Word, MS Excel, Power Point etc. So, ICT training programs should be re-oriented to facilitate a thoughtful, positive attitude and outlook towards ICT, MIS and e-Governance.

b. Devolve more decision-making authority to lower levels

In Bangladesh the governance system is over centralized and based on bureaucracy centric. Many government officers and offices of lower levels have no sufficient amount of work and responsibilities. Information System allows for decentralization of governance through easy sharing of relevant information and documents. The government should devolve sufficient financial and administrative authority to local level offices so that they can be enabled to prepare HRIS and take decision on own affairs independently.

d. Business process re-engineering

Re-integration and business re-engineering is two important issues to be addressed before thinking on MIS and HRIS. After re-organizing internal and external communication systems necessary portal and interfaces to be opened so that all the sub-systems can get access to information. So, in planning HRIS for different offices the Government should seriously explore opportunities for better integration and sharing of resources and knowledge among related government offices.

e. Create ICT infrastructure throughout the government departments

Expansion of Information System depends on an adequate level of ICT infrastructure throughout the government. It is almost impossible to step towards the area of Information System if the computers are remaining in the position of stand-alone (that is not connected with intranet, extranet, LAN or web-portals etc.). There should be plans for computers to be connected internally (intranet) in offices through local area networks, and in turn to be inter-connected with other relevant offices (internet) through a wide area network (WAN).

f. Set up an ICT Resource Centre

The government should take steps to set up ICT Resource Centre that would serve as a think tank and policy research organization on PIS ad other computer-based management programmes. The Centre should include representatives from the government, the private sector, and the academic community. Its responsibilities may include, inter alia:

- conducting Research on HRIS related issues.
- conducting training on advance management and techniques of decision making through HRIS. (Management Information System)
- monitoring HRIS initiatives in the country, evaluating progress and recommending actions.
- keeping track of best practices around the world.
- developing plans for HRIS, PIS, E-Governance technological architecture and choice of technology based on international benchmarks.
- developing HRIS prototype for public sector organization; for example the ICT resource centre can develop model HRIS for School Management Info System (SMIS).
- conducting needs assessments for HRIS in different government offices.
- serving as a meeting place and repository of information for government chief information officers (CIOs).

14. Conclusion

Information technology, especially through the increasing use of organizational intranets and HRIS enable more HR information to be collected and processed more comprehensively and with greater accuracy and speed. HR managers can take opportunities to have access and use of necessary information for taking prompt and correct decisions. It is an effective tool to take quality decisions and its implementation as well as analysis of HR interventions. A properly designed HRIS can provide an open-door access to employees, stakeholders, clients and customers and other interested parties which ultimately results a transparent, efficient and participative human resource management.

References

Mathur , Anil Kumar. New Delhi, India (1999), Human Resource Information System, IAMR Monograph Series.

Academy for Planning and Development, Handbook on Implementing E-government, Academy For Planning & Development, Dhaka, Ministry of Planning, Bangladesh.

Chowdhury, Mridul and Raihan, "Bangladesh", Global Information Technology Report 2000-2001, Publication of Harvard University and World Economic Forum, Ananya (2001), Dhaka, Oxford University Press

Yong, James JL, "E-Government in Asia: Enabling Public Service Innovation in the 21st Century", Times Media Press (2003), New York, USA

Planning Commission of Bangladesh, Unlocking the Potentials (PRSP document), Dhaka (2005).

Loyal L. Byars and Lesile W. Rue, Human Resource Management, New York (1984), McGraw-Hill, pp. 526-527

William P. Anthony, et al., Strategic Human Resource Management, New York (1993), Dryden Press, p. 179

John H. Bernardian and Joyce E.A Russell, Human Resource Management-An Experimental Approach, McGraw-Hill Fourth Edition, New York (1993), p.317

Boudreau J. 'HRIS: Adding Value, or Just Cutting Cost?' HR Monthly, 1992, May. P.8

Aswathappa, K. Human Resource and Personnel Management, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, India

Nankervis Alan, Compton Robert and Baird Marian. Strategic Human Resource Management, Thomson (2002), 102 Dodds Street, Southbank Victoria- 3006, Auutralia

Kenneth J. Mcbey, Monica Belcourt. Thomson-Nelson, Strategic Human Resource Planning, Thomson Business Information Private Limited (2006), Noida, New Delhi, India.

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
উনচত্বারিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৬/জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন ও সম্পদ আহরণ

(Local Development and Resource Mobilization through Local Government Institution)

ড. এস, জে, আনোয়ার জাহিদ *

Abstract: *Union parishad as a focal point of local government institutions has been implementing development activities at local level. For formulating local level plans and projects, identification of local problems/needs, identification of local resources, assessment of their quantity and valuation are necessary to design and implement local development plans through participation of the local people. The sources of resources of Union parishad are i) Financials (taxes, fees, government. grants, rents/investable income etc.), ii) Natural and infrastructural (ponds, rivers, hills, roads, schools, houses etc.), and iii) Human resources (educated skilled people, youths, women, local leaders and people living abroad etc.) as well. Through Union parishad is responsible for local development, many Union parishads can not able to perform mentionable contributions in the development of the local areas because of inadequate financial resources and little surplus in the revenue income after paying the salary and allowances of the elected members and staff of Union parishads. In such a perspective, it is necessary to identify the prevailing problems/needs of Union parishads, available local resources for implementing development programmes with a view to increasing income of the Union parishad. To solve the institutional problems relating to local resources mobilization and local development, some attempts could be undertaken as per prevailing laws of local government and at the same time central government could increase its support to enhance local development. Therefore, the Union parishad as a local government institution will able to support and initiate activities (e.g. rural works programmes, infrastructural works, irrigation etc.), which will help in the utilization of local resources for increasing production in rural areas.*

১.০ ভূমিকা

সাধারণ অর্থে উন্নয়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়। কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা, জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হয়। অর্থনীতিবিদদের মতে, উন্নয়নের চাবিকাঠি প্রধানত চারটি গুণকের মধ্যে নিহিত এবং এগুলো হলো প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা, মূলধন গঠন এবং প্রযুক্তি (সাহা, ১৯৮৯ঃ২৪)। বর্তমানে স্থানীয় উন্নয়নকে কয়েকটি সূচকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সক্ষমতা অর্জনের উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সুপরিকল্পিত কৌশল ও পদক্ষেপের মাধ্যমে আহরণযোগ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নত জীবনযাপনের জন্য বিদ্যমান সমস্যার সমাধানসহ অবস্থার গুণগত, আর্থ-মানবিক ও

* পরিচালক (পল্লী অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ), বার্ড, কুমিল্লা

সামাজিক উন্নতি সাধন। অধ্যাপক উইলিয়াম ও বাট্রিকের মতে, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন দেশের প্রাপ্ত সম্পদের যাথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবা কর্মের মাথাপিছু উৎপাদন স্থানীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন (পূর্বোক্ত, ১৯৮৯)।

স্থানীয় উন্নয়ন বলতে সাধারণত স্থানীয় জনগণের কাঙ্ক্ষিত চাহিদাপূরণ ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনকে বুঝানো হয়ে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আনয়ন, ভৌত অবকাঠামোর উন্নতি সাধন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে-স্থানীয় উন্নয়ন এবং জনগণের উন্নত জীবন যাত্রার জন্য এলাকার সমস্যা সনাক্তকরণ, সম্পদ চিহ্নিতকরণ, কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নিরূপণ, কর্মপদ্ধতি স্থিরকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এবং উৎপাদনকারীদেরকে সব সময়ই সম্পদের নতুন নতুন উৎসের অনুসন্ধান করতে হয়। সম্পদের নতুন নতুন উৎস সনাক্তকরণ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সনাক্তকৃত সম্পদকে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে রূপান্তর উভয় কারণেরই নতুন ও অধিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। সম্পদের আহরণ, উন্নয়ন, বন্টন ও যথাযর্থ ব্যবহার সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত। স্থানীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজন হলো আহরণযোগ্য সম্পদসমূহ সনাক্তকরণ এবং সম্পদের মূল্যায়নের মাধ্যমে এগুলোর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা এবং জনগণের প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিচালিত একটি স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম মূলত একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এ প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। চিমা এবং রনডিনেলী (১৯৮৩) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত নিম্নে উল্লিখিত পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন (হোসেন, ১৯৯২ঃ৫):

১। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হবে স্বায়ত্তশাসিত, স্বাধীন এবং এ প্রতিষ্ঠানসমূহে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

২। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখা বা এলাকা থাকবে।

৩। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ হবে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান যাদের নিজেদের উদ্যোগে দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা থাকবে।

৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হবে; এবং

৫। রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য একটি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সম্পদ আহরণ ও তার উপর কর্তৃত্ব ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে অভিহিত করা যায়। তবে

বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর্থিকভাবে কেন্দ্রীয়/জাতীয় সরকার অধিক সহায়তামূলক অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ম পরিধি ও আর্থিক ভিতকে মজবুত করে থাকে। ফলে স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি সুযোগ-সুবিধাসমূহ যথার্থ ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রের স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য দপ্তর, হাঁস-মুরগী পশুপালন দপ্তর, ভূমি অফিস, বিআরডিবি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ব্যাংক, এনজিও, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান, বিসিক ইত্যাদি স্থানীয় উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা-সহায়তা প্রদান করতে পারে। স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বিভিন্ন আর্থিক খাতগুলোকে সুবিন্যস্ত ও শ্রেণীভুক্ত করে কর্মপন্থা নির্ধারণে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে বিধায় সম্পদের যথাযথ মূল্যায়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সম্পদের যথাযথ মূল্যায়ন ও ব্যবহার ব্যতিরেকে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন বা দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সামগ্রিক স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ বিশেষ করে বনজ, পানি সম্পদ ও ভূমির বহুবিদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্পদ কোথায় ও কি পরিমাণ আছে এবং এর চাহিদা কিরূপ, ভবিষৎ চাহিদা ও মূল্য পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ব্যবহার কতটুকু প্রভাব ফেলবে, সম্পদের আহরণ কৌশল কি হবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন (Mitchell, ১৯৯৭)।

নিবন্ধের উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ আহরণ ও তার ব্যবহার সম্পর্কিত স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান অবস্থা ও সীমাবদ্ধতা সনাক্তকরণ, এতদ্‌সংক্রান্ত স্থানীয় সরকার বিধিমালা পর্যালোচনা এবং সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সুপারিশমালা প্রণয়ন। এ নিবন্ধে উল্লিখিত স্থানীয় উন্নয়ন ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ সম্পর্কিত আলোচনা মূলত ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

নিবন্ধ রচনার পদ্ধতি

গবেষণা নিবন্ধটি মূলত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর প্রণীত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত লেকচার স্ক্রিপ্ট, জার্নাল নিবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন এবং স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা হয়েছে।

স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন (Formulation of Local Development Plans)

উপর হতে নিচ (Top-down) পদ্ধতি পরিকল্পনার আওতায় প্রণীত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থেকে জনগণ উন্নয়নের যথাযথ সুফল পায় না এবং কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় না বিধায় স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এতে জনগণের অংশগ্রহণের অবশ্যকতা রয়েছে। কেননা স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয়/গ্রামীণ জনগোষ্ঠির চাহিদা/প্রয়োজন এবং আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কোন এলাকার সর্বাত্মক (Comprehensive)

উন্নয়ন, কোন কমিউনিটি, গ্রুপ বা দলের উন্নয়ন (ভূমিহীন, জেলে, মহিলা), কোন খাত/বিষয়ভিত্তিক উন্নয়ন (কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভৌত অবকাঠামো যেমন: রাস্তা-ঘাট/কালভার্ট সংস্কার/নির্মাণ) ইত্যাদির কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সম্পদ আহরণ, সম্পদরে ব্যবহার এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কোন এলাকার উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ভৌত অবকাঠামো সংস্কার/নির্মাণ, সামাজিক ও আর্থিক সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, সচেতনতা সৃষ্টি এবং উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে থাকে।

স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও আহরণ (Identification and Mobilization of Local Resources)

সম্পদ হচ্ছে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। ফলে কোন এলাকার সামগ্রিক (Comprehensive) বা খাতভিত্তিক (Sectoral) উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপণ ও সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ আহরণযোগ্য স্থানীয় সম্পদসমূহের পরিমাণ নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়। আহরণযোগ্য সম্পদের পরিমাণ স্থানীয় চাহিদা মেটাতে এবং সমস্যা সমাধান করতে কতটুকু সক্ষম হবে, কিভাবে এ সম্পদ সর্বাত্মক ব্যবহার করা যাবে এবং কি পরিমাণ সম্পদ সরকার ও বর্হি প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা যাবে তার ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় (জাহিদ এবং রহমান, ১৯৯৪:১১-১২)। স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়:

মানব সম্পদ ((Human Resources)	:	মানুষ তার জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে তাহাই মানব সৃষ্ট সম্পদ (হুদা, ২০০৮:৭৬)। স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পদ সৃষ্টিকারী এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকাপালনকারী এলাকার শিক্ষিত/দক্ষ/বুদ্ধিবান/জ্ঞান ব্যক্তি, যুব পুরুষ ও মহিলা, ডাক্তার, প্রকৌশলী কৃষিবিদ, উদ্যোক্তা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, প্রবাসী ব্যক্তি প্রভৃতি মানব সম্পদ চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয়।
জমি ও ভৌত সম্পদ (Land and Physical Resources)	:	জমি, বাগান, পুকুর, বসতবাড়ী, ঘর, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, দালান-কোঠা ইত্যাদির সংখ্যা/পরিমাণ নিরূপণ।
আর্থিক সম্পদ (Financial Resources)	:	সংগঠন/গ্রামবাসীর নগদ টাকা-পয়সা, সঞ্চিত অর্থ, সংগঠনের রাজস্ব আয়/প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি পরিমাণ নিরূপণ।
প্রাকৃতিক সম্পদ (National Resources)	:	নদী-নালা, খাল-বিল, হাওয়া/বাঁওর, পাহাড়-বালি, গাছ-পালা, খনিজ দ্রব্য, বন-জঙ্গল, আলো-বাতাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষ তাঁদের বুদ্ধি ও প্রতিভা কাজে লাগিয়ে এলাকার অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারে সেগুলোর সংখ্যা/পরিমাণ নিরূপণ (জাহিদ এবং রহমান, ১৯৯৪:১১-১২)।
সামাজিক ও সাংগঠনিক সম্পদ (Social and Institutional Resources)	:	স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন যেমনঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সমবায় সমিতি, কমিউনিটি, ক্লাব ইত্যাদির সেবা-সহায়তা, যৌথ চিন্তা ও উদ্যোগ/সিদ্ধান্তসমূহ, সামাজিক সংহতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির ভূমিকা নিরূপণ ও স্থানীয় উন্নয়নে এর যথাযথ ব্যবহার।
সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সেবা-সহায়তা (Support-services of Government and Non-government organizations)	:	সরকারি জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের সেবা-সহায়তা যেমনঃ কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি, ঋণ, সেচ, স্বাস্থ্য-সেবা/পরিবার পরিকল্পনা, বাজারজাতকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধিতমূলক প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ইত্যাদির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও এলাকার উন্নয়নে এগুলোর ব্যবহার।

স্থানীয় সম্পদের প্রকারভেদ

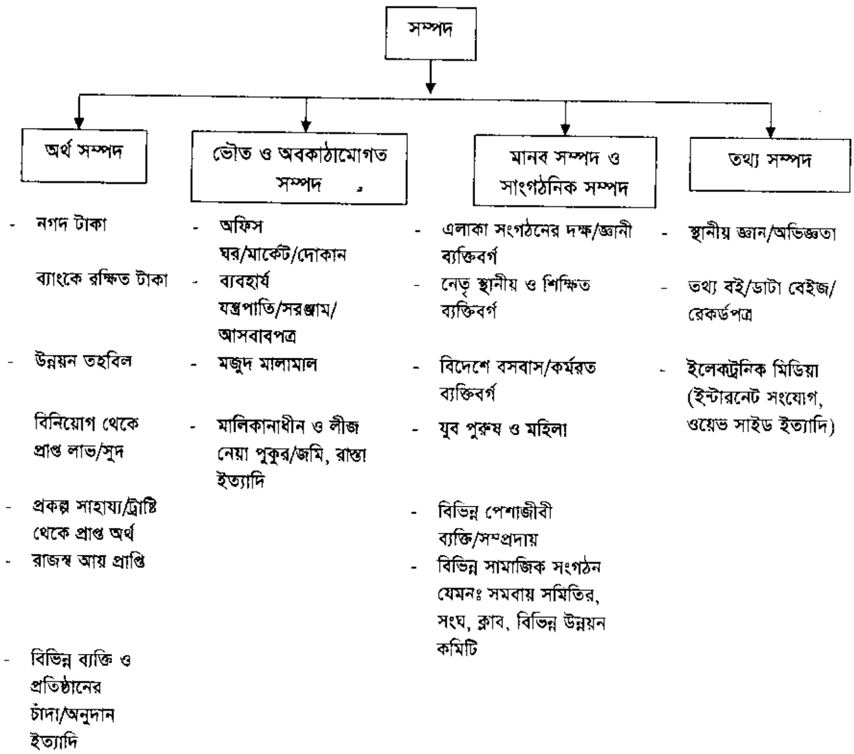

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার কতগুলো ধাপে আবর্তিত হয়ে থাকে। ধাপসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে:

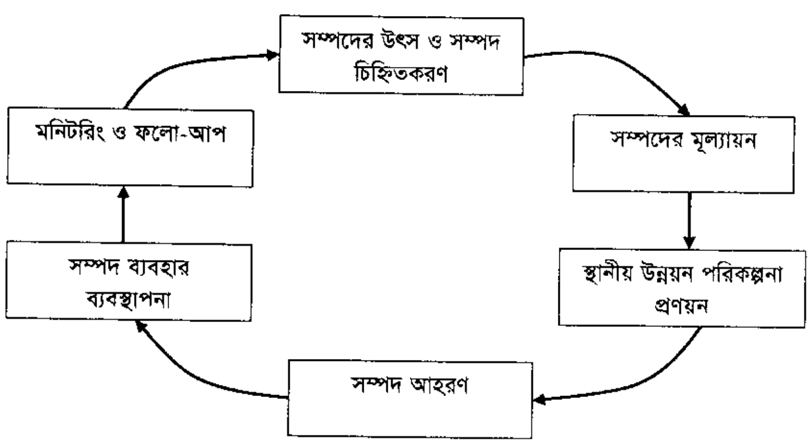

ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ আহরণের উৎস ও তহবিল গঠন (Sources of Resource Mobilization and Formulation of UP Fund)

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণত দুইভাবে তহবিল গঠন করতে পারে। প্রথমত, কেন্দ্রীয়/জাতীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং অনুদানের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, নিজস্ব উদ্যোগে সম্পদ আহরণের মাধ্যমে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় যত বাড়বে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতা তত কমবে। যেহেতু, উন্নয়নশীল দেশসমূহের সরকার নিজেরাই আর্থিক সংকটে থাকছে সেহেতু, তাদের পক্ষে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত চাহিদা মেটানো প্রায়ই সম্ভব হয় না। এ কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ জোর দেয়ার প্রয়োজন হয়। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নোক্ত উৎস হতে সম্পদ আহরণ এবং তহবিল গঠন করতে পারে:

১। কর, ফি ও অন্যান্য চার্জসমূহের মাধ্যমে;

২। ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ন্যস্ত অথবা এর দ্বারা পরিচালিত সম্পত্তির ভাড়া ও মুনাফার মাধ্যমে;

৩। ব্যক্তি বিশেষের বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা;

৪। ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় সকল ট্রাষ্ট হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা;

৫। সরকারি ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা;

৬। সকল প্রকার বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভসমূহ দ্বারা; এবং

৭। ইউনিয়ন পরিষদে সরকার কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ।

উপর্যুক্ত উৎসসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ কর, ফি, চার্জ, সরকারি ও ব্যক্তি বিশেষের অনুদান এবং ব্যবসা পরিচালনা করে তার লাভের মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারে। মূলত, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ৩টি উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করে থাকে। উৎসসমূহ হচ্ছে, (১) কর, (২) ফি এবং (৩) সরকারি অনুদান। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদকে ৬টি স্থানীয় উৎস হতে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। উৎসগুলো নিম্নরূপ-(স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ২০০৮):

১) বাড়ীঘর ও দালান কোঠার উপর কর;

২) ব্যবসা, পেশা এবং বৃত্তির উপর কর;

৩) সিনেমা, নাটক ও থিয়েটার প্রদর্শনী এবং প্রমোদমূলক যে কোন আয়োজনের উপর প্রমোদ কর;

৪) লাইসেন্স ও পারমিটের উপর কর;

৫) হাট, বাজার এবং ঘাট ইজারা লব্ধ অর্থ;

৬। জলমহাল থেকে ইজারা লব্ধ অর্থ;

হাট-বাজারসমূহ ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল এবং এ উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ইউনিয়ন পরিষদসমূহ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করতো (হোসেন: ১৯৮৪)। ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে হাট বাজার উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করায় ইউনিয়ন পরিষদ তার নিজস্ব আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হারিয়েছে। এছাড়া আইন এবং সংসদ বিষয়ক পরিপত্র নং-৩০, আর নং-৬/১ এম-১৮, তারিখ:২০/০২/৯৭ অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর ১% ইউনিয়ন পরিষদ পাচ্ছে। এসব খাত ছাড়াও নিম্নলিখিত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছেঃ

- সরকারি অনুদান (চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীর অংশ, সচিব এবং কর্মচারীদের বেতন ও উৎসব ভাতা)।
- কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।
- ইউনিয়ন পরিষদের সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত ভাড়া বা মুনাফা।
- ইউনিয়ন পরিষদের বিনিয়োগ হতে লাভ।
- সরকার অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

সম্পদ আহরণের সম্ভাব্য অন্যান্য উৎস:

ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে কোন কোন খাত হতে স্থানীয় সম্পদ আহরণ করে থাকে তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত খাত ছাড়াও স্থানীয় সম্পদ আহরণের উৎস নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহের বর্ধিত করার বিবেচনা করা যেতে পারে:

(ক) বিবাহ নিবন্ধকরণ ফি এর অংশ।

(খ) গভীর ও অগভীর টিউবওয়েল এর উপর ফিস।

(গ) সকল ধরনের সার্টিফিকেট/ছারপত্র প্রদানের জন্য ফি।

(ঘ) পল্লী বিদ্যুতের খুটির উপর কর।

স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার (Utilization of Local Resources)

স্থানীয় এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার উন্নয়নে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। একদিকে ইউনিয়ন পরিষদের সীমিত আয় অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের সিংহ ভাগই ব্যয় হয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক খাতে যেখানে এ খাতের ব্যয়ের তুলনায় উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় এক চতুর্থাংশ (হোসেন, ১৯৯২:১৪)। তবে অনেক ইউনিয়ন পরিষদ নিজস্ব আয় হতে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা ও কর্মচারীদের

বেতনের অংশ মেটানোর পর বিধি অনুযায়ী নিজস্ব আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে পারছে না। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কাজও কেবল রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, মেরামত ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইউনিয়ন পরিষদগুলো নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টার পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে কেবল সরকারি অনুদানের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

আহরণযোগ্য স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও এলাকার চিহ্নিত সমস্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর মৌলিক চাহিদাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত মৌলিক চাহিদাসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয় :

ক) খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ: এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির ন্যূনতম খাদ্য চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ এবং আর্সেনিক দূষণমুক্ত খাবার পানির নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ বা হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন করা।

খ) স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়ন: স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পল্লীর জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, সামাজিক বনায়ন, সামাজিক পরিবেশ উন্নয়ন এবং ক্লিনিক/মাতৃমঙ্গল/হাসপাতাল ইত্যাদির সুবিধাদি যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ পারিপার্শ্বিক এলাকার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে নর্দমা/আবর্জনা/ময়লা ফেলার স্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

গ) শিক্ষা ও উন্নয়ন: শিশু শিক্ষা/নারী শিক্ষা/বয়স্ক শিক্ষা ও সর্ব শ্রেণীর শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার মান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি: স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রহণে সহায়তা প্রদান।

ঙ) নিরাপত্তা ও আইন শৃংখলা: বিবাদি মিমাংসা, সামাজিক সালিশ, ন্যায়বিচার, চুরি/ডাকাতি/সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি নিশ্চিত করা।

চ) চিত্ত-বিনোদন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান: ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও টিভি/রেডিও-র অনুষ্ঠান উপভোগ, ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা।

ছ) অবকাঠোমো উন্নয়ন: রাস্তাঘাট, পুল/কালভার্ট, ডাক ও তার, বিদ্যুৎ, পানি নিস্কাশন/বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থা, কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মাণ, কুটির শিল্প ইত্যাদির উন্নয়ন।

জ) কৃষি উন্নয়ন: এলাকার শস্য উৎপাদন, গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার ও সেবা-সহায়তা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন।

স্থানীয় উন্নয়ন ও সম্পদ আহরণের সমস্যা (Barriers to Local Development and Resources Mobilization)

ইউনিয়ন পরিষদকর্তৃক স্থানীয় সম্পদ আহরণের সমস্যাসমূহ নিম্নে দেয়া হলো:

১। নেতিবাচক রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী এবং জনপ্রিয়তা হ্রাসের আশংকার কারণে নির্বাচিত সদস্য ও চেয়ারম্যান স্থানীয় আয় বৃদ্ধি বিশেষত কর ও ফি আদায়ে উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যোগ নেন না;

২। স্থানীয় সরকার (ইউপি) অর্ধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারীর পর ইউনিয়ন পরিষদের কর আদায়ের খাত/উৎস যেমন: হাট-বাজার ইজারা, প্রাকৃতিক জলাশয় লিজ হতে প্রাপ্য আয় হ্রাস পায়;

৩। গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নগামী হওয়া এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোন বছর কর আদায় করা সম্ভব হয় না;

৪। আর্থিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিগণেরও কর প্রদানে অনীহা থাকায় কর আদায় হ্রাস পাচ্ছে;

৫। ধার্যকৃত কর অপেক্ষা প্রকৃত আদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম হয়ে থাকে। কারও উপর কর ধার্য করা নির্ভর করে মূলত: ঘর-বাড়ীর সম্পদের মূল্য নির্ধারণের উপর। অনেক ক্ষেত্রেই সম্পদের মূল্য নিরূপণ সঠিকভাবে করা হয় না;

৬। ইউনিয়ন পরিষদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী কর আদায়কারী না থাকায় কর আদায় করা যায় না। অনেক সময় আদায়কারীরা আদায়কৃত টাকা জমা প্রদানে বিলম্ব করেন।

৭। স্থানীয় উন্নয়নের প্রতি গ্রামীণ জনগণ/সুফলভোগীদের নৈতিবাচক মনোভাব ও স্বতঃস্ফূর্ত সীমিত অংশগ্রহণ;

৮। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমিত ব্যবহার বা অপব্যবহার যেমন: পানি সম্পদ এবং পার্বত্য ও অন্যান্য এলাকার পাহাড় বা উঁচু ভূমি ইত্যাদি সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহার।

৯। স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব; এবং

১০। ফলপ্রসূ নীতি, কৌশল ও যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগের অভাব।

স্থানীয় উন্নয়ন ও সম্পদ বাড়ানোর উপায় (Ways of Development and Increasing Local Resources)

১। স্থানীয় সম্পদ আহরণ সম্পকির্ত অধ্যাদেশ, স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ এবং আহরণ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা;

২। স্থানীয় উন্নয়নে সুফলভোগীদের চাঁদা (Beneficiaries Contribution) আদায় বিষয়টি গুরুত্ব প্রদান এবং সুফলভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে;

৩। পরিকল্পনা/প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় যেমন, প্রকল্প সনাক্তকরণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সুফলভোগে গ্রামীণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৪। স্থানীয় সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

৫। স্থানীয় সম্পদ বাড়ানোর লক্ষ্যে এমন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে বস্তুগত অগ্রগতি অর্জন হয় কিন্তু তাতে পরিবেশের তেমন ক্ষতি সাধন না হয় (আহমেদ, ১৯৯১)।

৬। ধার্যকৃত কর আদায় না হলে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭। ইউনিয়ন এলাকার কর নিরূপণ এবং আদায়ের জন্য পরিষদের নিজস্ব বেতনভুক্ত স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা যেতে পারে (হোসেন, ১৯৯২:১৬)

৮। ইউনিয়নের অন্তর্গত স্থায়ী সম্পদসমূকে চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তালিকাভুক্ত সম্পদের উপর যথাযথ হারে কর নিরূপণ/ধার্য করা ও তা আদায়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা (আহমেদ ও কাদের, ১৯৯১: ৪৮)।

৯। ইউনিয়নের আওতাধীন যানবাহন ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পেশার জন্য ফি ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা (আহমেদ ও কাদের:১৯৯১)।

১০। ইউনিয়ন পরিষদসমূহ পরিষদের আয়বৃদ্ধি, জনগণকে সেবা প্রদান ও নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অর্থকরী কাজে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে পরিষদের আয় বৃদ্ধি করা (হোসেন, ১৯৯২:১৭)।

১১। স্থানীয় কর, রেইট, ফি বৃদ্ধিকল্পে প্রচারণা বৃদ্ধি করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১২। ইউনিয়নের অন্তর্গত খাস পুকুর, খাস জমিসমূহ ইউনিয়ন পরিষদের নিকট লিজ দেয়ার ব্যবস্থা করা যাতে তা চাষাবাদ অথবা পুনরায় লিজের মাধ্যমে পরিষদের আয় বৃদ্ধি করা যায়। ইউনিয়নের অন্তর্গত জলমহাল, হাটবাজার, ফেরীঘাট ইত্যাদি ইজারা দেয়ার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা।

১৩। ডেভির মতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দু'টি উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারে- ক) সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে, এবং খ) লাভের উদ্দেশ্যে। এতদুদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ক্ষুদ্র শিল্প, মৎস চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুর খামার, কৃষি খামার, বিনোদনের উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি কার্যক্রম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করতে পারে। সম্পদ উন্নয়ন বিশেষ করে মার্কেট নির্মাণ, বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা ইত্যাদি কাজেও ইউনিয়ন পরিষদ পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। যেমন,

ক) সম্পদের ঘাটতি দেখা দিলে;

খ) কমপক্ষে মধ্য-মেয়াদ সম্পন্ন সরঞ্জামাদি কেনার জন্য;

গ) আয় সম্ভব এমন খাতে পুঁজি বিনিয়োগ; এবং

ঘ) দীর্ঘ মেয়াদী সম্পদ গঠন/উন্নয়নের জন্য

১৪। জাতীয় সরকারের মোট রাজস্ব আয়ের একটি অংশ সরকারি বরাদ্দ হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য দেয়া যেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন জনসংখ্যা, ইউনিয়নের পশ্চাৎপদতা, সম্পদ, গৃহীত কার্যক্রমের সাফল্য ইত্যাদির ভিত্তিতে এ বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে।

উপসংহার

স্থানীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদ আহরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও স্থানীয় সম্পদ আহরণের সমস্যা ও সম্ভাবনা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের আর্থিক ভীত দুর্বল তথা দারিদ্রের মাত্রা ও নিম্ন-আয়ের জন্য স্থানীয় সম্পদ আহরণ একটি কষ্টসাধ্য কাজ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ফলে সরকারের উপর হতে নির্ভরশীলতা হ্রাসকল্পে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদকে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন, যাতে প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কল্পে নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মচারীদের প্রচেষ্টা, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রচেষ্টা গ্রহণ। প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমস্যা দূরীকরণ ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ইউনিয়ন পরিষদের অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা কমানো যায়।

৪। স্থানীয় সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

৫। স্থানীয় সম্পদ বাড়ানোর লক্ষ্যে এমন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে বস্তুগত অগ্রগতি অর্জন হয় কিন্তু তাতে পরিবেশের তেমন ক্ষতি সাধন না হয় (আহমেদ, ১৯৯১)।

৬। ধার্যকৃত কর আদায় না হলে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭। ইউনিয়ন এলাকার কর নিরূপণ এবং আদায়ের জন্য পরিষদের নিজস্ব বেতনভুক্ত স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা যেতে পারে (হোসেন, ১৯৯২:১৬)

৮। ইউনিয়নের অন্তর্গত স্থায়ী সম্পদসমূকে চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তালিকাভুক্ত সম্পদের উপর যথাযথ হারে কর নিরূপণ/ধার্য করা ও তা আদায়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা (আহমেদ ও কাদের, ১৯৯১: ৪৮)।

৯। ইউনিয়নের আওতাধীন যানবাহন ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পেশার জন্য ফি ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা (আহমেদ ও কাদের:১৯৯১)।

১০। ইউনিয়ন পরিষদসমূহ পরিষদের আয়বৃদ্ধি, জনগণকে সেবা প্রদান ও নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অর্থকরী কাজে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে পরিষদের আয় বৃদ্ধি করা (হোসেন, ১৯৯২:১৭)।

১১। স্থানীয় কর, রেইট, ফি বৃদ্ধিকল্পে প্রচারণা বৃদ্ধি করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১২। ইউনিয়নের অন্তর্গত খাস পুকুর, খাস জমিসমূহ ইউনিয়ন পরিষদের নিকট লিজ দেয়ার ব্যবস্থা করা যাতে তা চাষাবাদ অথবা পুনরায় লিজের মাধ্যমে পরিষদের আয় বৃদ্ধি করা যায়। ইউনিয়নের অন্তর্গত জলমহাল, হাটবাজার, ফেরীঘাট ইত্যাদি ইজারা দেয়ার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা।

১৩। ডেভির মতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দু'টি উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারে- ক) সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে, এবং খ) লাভের উদ্দেশ্যে। এতদুদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ক্ষুদ্র শিল্প, মৎস চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুর খামার, কৃষি খামার, বিনোদনের উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি কার্যক্রম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করতে পারে। সম্পদ উন্নয়ন বিশেষ করে মার্কেট নির্মাণ, বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা ইত্যাদি কাজেও ইউনিয়ন পরিষদ পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। যেমন,

ক) সম্পদের ঘাটতি দেখা দিলে;

খ) কমপক্ষে মধ্য-মেয়াদ সম্পন্ন সরঞ্জামাদি কেনার জন্য;

গ) আয় সম্ভব এমন খাতে পুঁজি বিনিয়োগ; এবং

ঘ) দীর্ঘ মেয়াদী সম্পদ গঠন/উন্নয়নের জন্য

গ্রন্থপঞ্জি

জাহিদ, এস, জে, আনোয়ার (২০০০), বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার বিবর্তন, ধরন, গতিধারা ও অন্তরায়সমূহ, পল্লী উন্নয়ন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর ষাণ্মাসিক পত্রিকা, জুলাই ২০০০ সংখ্যা।

আহমদ, কাজী খলিকুজ্জমান (১৯৯১), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা প্রসঙ্গে, উন্নয়ন বির্তক, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুন ১৯৯১, ঢাকা।

সাহা, সরোজ কুমার (১৯৮৯), শিল্প উদ্যোগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পোদ্যোগ পরিচিতি, রহমান ও অন্যান্য সম্পাঃ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যায়ল মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।

জাহিদ, এস, জে, আনোয়ার এবং মিজানুর রহমান (১৯৯৪), স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা।

হোসেন, শিরিন (১৯৯২), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সম্পদ আহরণঃ ইউনিয়ন পরিষদের অভিজ্ঞতা, পল্লী উন্নয়ন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, জানুয়ারী ১৯৯২।

আহমেদ, তোফায়েল এবং কাদের আবদুল (সম্পাঃ) (১৯৯২), ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ একটি কর্মশালা প্রতিবেদন, বার্ড, কুমিল্লা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৩), স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ, ১৯৮৩।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (২০০৮), ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স দ্বিতীয় রুরাল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইনষ্টিটিউশনাল সাপোর্ট কনসালটেন্টস), ঢাকা।

হুদা, ইনামূল (২০০৮), তৃণমূল সংগঠন গঠন ও ব্যবস্থাপনা, সাহানা ইনাম (প্রফি), ঢাকা।

Cheema, G. S. and Randinelli, D. A. (1983), Decentralization and Development, SAGE Publication, London.

Mitchell, Bruce (1979), Geography and Resource Analysis, London Inc, New York.

Bangladesh Bureau of Statistics-BBS (1998), Year Book of Agricultural Statistics of Bangladesh, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
ঊনচত্বারিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৬/জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

The Practice of Dowry in Bangladesh: A Study on Existing Situation and Reasons for Sudden Bloom up

Nadira Sultana *
Mohammad Sajjad Hossain Bhuiyan **

Abstract: *Dowry was available in different parts of the world. With the advent of modernization, the custom is disappearing in different parts of the world expect some of the part of Indian subcontinent. It has becoming a severe problem in this part. Dowry is an old and holy phenomenon among the Hindus in South Asia. It was not an Islamic custom and it was not available among the Muslim in the subcontinent even only 60 years ago. Suddenly, it becomes a very common issue and causing enough violence and brutality in conjugal life among both Hindus and Muslims in Bangladesh. This study is going to discuss the existing situation of dowry violence and trying to see the problem from a new perspective using the model of "Social Relation Approach" developed by Kabeer and others. The article highlights how the changes in the social system is placing women in a more vulnarable situation. The essay tries to find out the relationship of institutions and how they produce, reinforce and reproduce a custom and thus inturns trigger dowry practice and dowry violence in the society. It also provides some suggestions to stop dowry practice and dowry violence.*

1.0 Introduction

The dowry system is a widely spread custom that can be analysed in terms of its relevance for macro institutions - the state, market and also at the micro household and community levels. But most importantly, it needs to address the power relations between men and women. However, the scope of this study is to focus on the existing situation of dowry practice in Bangladesh and find out causes responsible for such sudden expansion of dowry practise in the country.

It dates back at least to the ancient Greco-Roman world. With the barbarian invasions, the Greco-Roman institution of dowry was eclipsed for a time as the Germanic observation of bride price became prevalent throughout much of Europe. It was however widely reinstated in the late Middle Ages. In Medieval Europe dowries were common practice among

* Assistant Commissioner, Rangpur Collectorate

** Upazila Nirbahi Officer, Chonarughat, Habigonj

most social and economic groups. The dowry system was also practiced in China as a way for the family to secure some of its wealth for its daughters as women could not inherit property in the orthodox Confucian society of China (Anderson 2003, pp. 271- 272).

In South Asia dowry has stronger roots than in the other parts of the world. With the advent of modernization dowry is disappearing in different parts of the world but it is becoming a sever problem in the subcontinent. Dowry is an old and Holy phenomenon among the Hindus in South Asia (Banerjee 1996, p. 2 and Saleh 2004, p.2). The Hindu tradition of dowry was originally limited to the holy caste Brahmin and it was also regarded as a status symbol. The status symbol was later spread among other Hindu castes in India. The root cause of the problem behind dowry is Hindu religious orthodoxy and its degenerate caste system (Banerjee 1996, p. 2). It was in the early 1950s when dowry started to be considered as a 'social evil' (Sitarama 1999, p. 1). These days, the custom has rendered enough violence and brutality among the conjugal lives of both Hindu and Muslim communities.

Dowry is not an Islamic custom. It wasn't available among the Muslim in the subcontinent only 60 years ago. Among the Muslims, the bridegroom has to pay Dower (bridal money) to the bride during the marriage. Ramakrishana Mukhejee, in his pioneer study of Bengal villages in the early 1940s, reported that the giving of bride prices (Dower) among the Muslim population was declining, and that dowry system, was making its first appearance among the better-off Muslim families (Mukherjee, R 1971: 272-5 cited from Hartmann, B and Boyce, J, K, 1990, p. 83). But now it is being widely practised among the Muslim population of the subcontinent as well and it plays a key role in most wedding arrangements especially in Pakistan and Bangladesh. Moreover, It alone became the biggest cause of family dispute and violence against wives in Bangladesh. A UNDP study in Bangladesh reports,

"The incidence of physical and verbal abuse of wives due to non-fulfilment of dowry obligations by their fathers is so high that it is almost considered a norm. It occurs in at least 50% of recent marriages." (The Hunger Project undated, p. 20).

The problem is taken seriously by the government of Bangladesh. The practice of dowry was banned by law in 1985. Ensuring good governance

and mainstreaming gender in policy and law is now considered to be the most vital issue of the government. However, various measures taken by the government and others no significant change has taken place to reduce the magnitude of dowry rèlated violence against women. Still the evidence shows that it has blooming up dramatically in the recent years. Some (Suran et al 2004. p. 3) termed this phenomenon as dowry inflation.

1.1 Objectives of the Study

Dowry issues are a consequence of the interactions of a set of multifarious factors. There are some common socio-economic, cultural and demographic issues that led to the expansion of the problem in the society. This study will help the government and others to find a better solution of dowry system. The objective is to

a) Identify what the causes are and what let the problem to bloom up, and

b) What can be helpful for reducing the dowry violence and stop the practice.

1.2 Research Questions

1. What is the existing situation of dowry practice in Bangladesh?
2. What are the contributing factors involved in dowry system in Bangladesh?
3. What can be done to combat dowry violence?

2.0 Review of the Literature and Theoretical Framework

Almost every study (Bhat and Halli 1999, p. 129, Srinivasan and Lee 2004, p. 1109, Banerjee 1996, p. 2, Sharma, et al 2002, p. 252-253, Anderson 2003, p. 292-95) show that dowry is an old custom among the Hindus of Indian subcontinent. Some (Bhat and Halli 1999, p. 129, Rudd, 2001, p. 516) argue it was as a substitute of pre-mortem inheritance for female child among Hindus. Now it has turned into a major cause of indebtedness for many families and a major root of violence and brutality against many women. What began as gift of land to a woman as her inheritance today has degenerated into gifts of gold, clothes, consumer durables and large sums of cash, which sometimes entailed the impoverishment and heavy indebtedness of poor families (My Nation 2005, p. 1).

There are various factors responsible for the dowry practice in

Bangladesh. In case of Bangladesh, dowry is comparatively a new phenomenon. Surprisingly, within a very short period it has become very widespread in the country especially in the rural areas. The study conducted by Mannan (2004, p. 47) in two different districts of Bangladesh shows that 95% of women had to pay dowry at the time of marriage. The underlying causes of dowry are different as identified by different researchers in Bangladesh.

Lindenbaum's work (1981, pp. 394-399) identifies that the change of marriage transactions began in the early 1950s and 1960s and it makes its first appearance in the urban wealthy families which was a manifestation of capitalism and a desirable groom with a monthly salary.

Hayward's (2000, pp. 101-104) study confines on the spreading nature of dowry practice in the subcontinent, and its consequence., He provided a good auto ethnography to give a pen picture of vulnerability of women and their families in the society. He reveals that refusal to pay dowry leaves many girls unmarried.

Khan (2001, p. 124) highlighted the problem only from economic perspective. She blames unemployment problem as responsible for dowry and it is also viewed as compensation from the part of the parents whose daughter is ugly or has a dark skin.

Mannan (2003, pp. 42-43) viewed that the recent emergence of dowry among Bangladeshi Muslims is more due to simple greed and commercialisation of marriage than the impact of a traditional culture, the urge of hyper gamy and the undermining of the women's productive role. He did not mention what let to the development of the sudden commercialization of marriage and greed.

Suran et al. (2004, p. 4) used the Benquest theory of dowry and try to find out its implication in rural Bangladesh. The study finds out that contrary to the prediction of the Benquest theory, married females who paid dowry at marriage have a higher likelihood of reporting domestic violence compared to those who did not. He opines that dowry is due to a switch from a surplus of potential bridegroom to a surplus of potential brides since in the early 1970s, as a status symbol in the society.

Nazneen (2004, pp. 12-13) discussed some factors responsible for dowry practice in Bangladesh. She stated that women's dependence on marriage, increasing number of unmarried women compared to the unmarried men,

shift in economic scenario, hyper gamy and capitalism are the major causes of dowry in the country.

Saleh (2004, pp. 4-10) disagrees with the common belief that dowry was first shown in the Hindu culture. She agrees with Islam (2004) saying that the system was first established in our society in ancient time when non-Aryans gave their daughters to Aryans for large amounts of dowry. Later it becomes a widely used custom among Hindu marriage and the Muslim community in Bangladesh adâpted it when it was a part of India. On the other hand what let to society to adapt the custom that doesn't have any root to its culture is not identified.

Many scholars have addressed the origin and development of dowry practice in Bangladesh from different perspectives. Some attribute it to the religious custom, some blame market and marriage squeeze, some blame culture and patriarchy, and some others blame capitalism and materialism. Some of the issues were already available in the society even before the problem is there and some of them are new. But the question is if the old factors were causing the problem why it becomes suddenly so inflationary. Or even if the new issues were causing the trouble the question arises how it has suddenly changed our behaviour. We need to look at the problem from a new perspective and try to find out a more effective way to address the problem.

2.1 Framework of Analysis

The paper would like to introduce the social relation approach to analyse the dowry problem in the country. The study will try to identify the factors from the perspective of Gender Inequality and Social Relations Approach Concept 3: Institutional Analysis. It will help us to find out the underlying causes for dowry practice in the country. The approach is developed by Naila Kabeer in association with policy makers, academics, and activists primarily from the South (March, Smyth, and Mukhapadhay 1999, p.102). The major assumptions made by Kabeer is that the roots of gender inequality are not confined to the household and family but are reproduced across different institutions, including the international community, the state, and the market. Kabeer (1994 cited in March, Smyth, and Mukhapadhay 1999, pp.104) describes institution as a framework of rules for achieving certain social or economic goals. It produces, reinforces, and reproduces social relation and thus generates

and perpetuates social difference and social inequality. There are four key institutional locations identified by Kabeer.

Table 1 : Example of Social Relations Concept 3: Institutional Analysis

Key Institutional Locations	Organization or structural form
State	Legal, military, administrative organizations
Market	Firms, financial corporations, farming enterprises, multinationals, and so on
Community	Village tribunals, voluntary associations, informal networks, patron-client relationships, NGOs
Family/ Kinship	Household, extended families, lineage grouping etc.

Kabeer (1994 cited in March, Smyth, and Mukhapadhyay 1999, pp.104-106) argues that the institutions are not ideologically neutral and they are the cause of producing, reinforcing and reproducing social differences and inequalities. The approach tries to establish that we must move beyond the official ideology of bureaucratic neutrality, and scrutinise the actual rules and practice of institutions to uncover their core values and assumptions. She also challenges the myth of the independence or separateness of institutions. It argues that they are inter-related, and that change in the policy or practise in one institution will cause changes in the others.

2.2 Five Aspects of Social Relations Shared by Institutions

Kabeer identifies that all institutions have five interrelated features such as rule, resources, people, activities, and power. She argues that these dimensions are useful in analysing gender inequalities.

Rules: how things get done

The framework identifies two types of rules i.e. official or unofficial (norms, values, laws, traditions, customs etc) that permit everyday decisions to be made with the minimum of effort.

Activities: what is done

There is a routinized pattern of practice for carrying out tasks. It causes certain tasks to get attached to certain social groups and it is considered that they are only capable of doing that particular task which is attached

with reward. These vary according to who does what. This creates a hierarchy of rewards, and reinforces inequalities between women and men. The gender division of labour attributes that women are good at certain activities which are at the same time, less recognised. It, in turn, develops the unequal relationships.

Resources: what is used, what is produced

Resources in the society are governed by institutional rules. Resources include human resources (for example, labour, education, and skills), material ones (food, assets, land or money), or intangible ones (information, political, clout, goodwill or contacts). For instance, it is men's responsibility to feed the family and they are given privileged access to resources such as land and other property.

People: who is in, who is out and who does what?

Institutions deals with people, who they allow in and are selective about; who is assigned with various resources, tasks and responsibilities? Who is positioned where in the hierarchy? This selection reflects class, gender, and other social inequalities. For example, marring cross class, race and ethnic dividing lines etc.

Kabeer stated (1994 cited in March, Smyth, and Mukhapadhyay 1999, pp.104-109) that the unequal distribution of resources and responsibilities, together with the official and unofficial rules which promote and legitimise this distribution, ensures that some institutional actors have authority and control over others. These individuals then promote practices which entrench their privileged position, and they are most likely to resist change.

The essay will try to find out the relationship of institution that produce, reinforce and reproduce and thus in turn triggers dowry practice and violence in the society.

Figure 1: Social Relations Concept 3: Key institutions and their relations

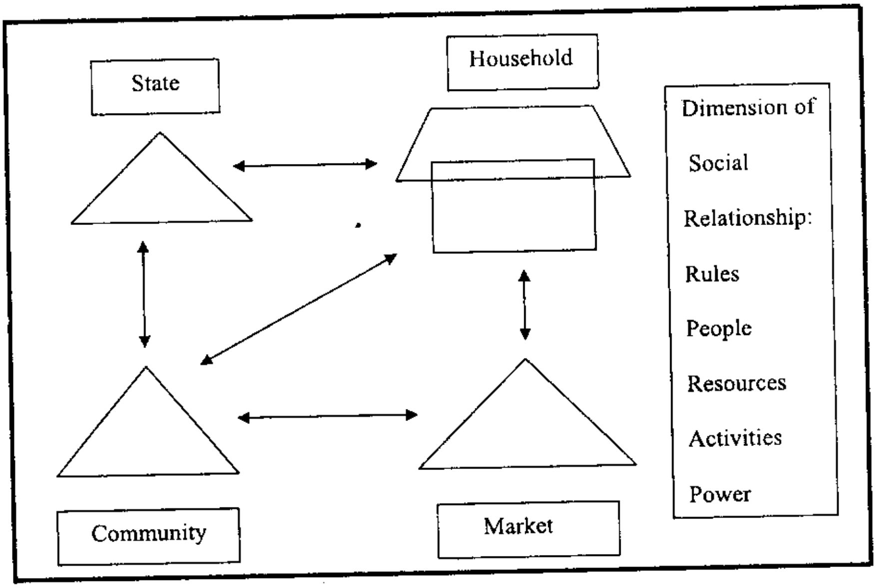

(March, Smyth, and Mukhapadhay 1999, pp.108)

The diagram shows the interrelatedness of the institution diagram and how they create social inequalities.

Eisenstein (2004, pp. 188-199) sees patriarchy as a structure of domination and exploitation. She argues that modern world makes the living harder for women than ever before. Global capitalism exposes women to new levels of exploitation and also instigates new yearning for democracy that cannot easily be dismissed as simply bourgeois. We need to conduct an extensive research to identify the causes behind the violent behaviour of the male counterparts. Dowry related violence can also be seen as the result of a patriarchal power structure and also as a result of global capitalism. A more balanced power structure and an equal access to power and freedom can ensure a free society.

3.0 Research Approach

This research relies on secondary qualitative case studies and quantitative data in the main. It will be based on a critical review of secondary data. The research also takes into account the existing laws relating to gender, policy booklets, government or semi government publications, and research done by local and international experts, different NGOs, proceedings, working papers and other documents.

4.0 Existing Situation in Bangladesh

Many researchers and practitioners (Suran et al. 2004, p. 7, Lindenbaum, 1981 pp. 394-395, Mannan 2003, pp. 43-44) argue that dowry does not have any roots within Muslim and Christen cultural history within Bangladesh. They argue that it is a recent cultural penetration that has created social problems in the country. Mukherjee reported that the dowry system first emerged among the better-off Muslim families in the early 1940s (Mukherjee 1971: 272-5 cited from Hartmann and Boyce 1990:83). Lindenbaum (1981 p. 395) identifies that the practice began among the wealthy urban families of Bangladesh in the 1950s, the major change in this region took place in the 1960s and was just beginning among some poorer families in the early 1970s. Mannan (2003, p. 44) agrees with Siddiqi (2002) that dowry seems to have started only after independence and that has increased dramatically since the 1980s. Despite the disagreement about its origins and causes, many critics are in agreement that dowry practice undermines social justice and human rights and that it is appropriate that it has been legally banned in Bangladesh, because it has been recognized as the major cause of violence against women in Bangladesh (Mannan 2003, BNWLA 2004, p. 44, pp. 12-23, Women for Women 2001, pp. 27-29). The rate of dowry oppression is increasing day by day. The statistics of violence against women received from police head-quarters show the increased rate of violence relating to dowry.

Table: 2: Statistics of Dowry Violence against Women Received from Police Head-quarters

Year	Women Oppressed by the Practice of Dowry
1996	511
1997	747
1998	832
1999	1119
2000	4302
2001	3012
2002	5284
2003	6165
2004	885
2005	3130
2006	956 (Up to April)

Figure 2: Number of Oppressed Women in Bangladesh

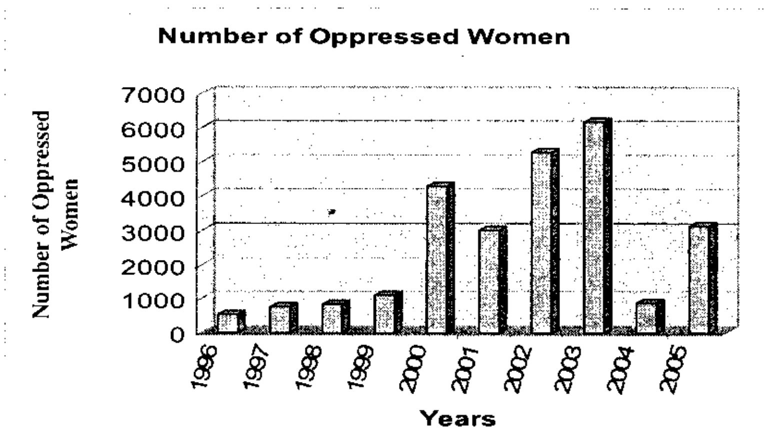

The data collected from the police head-quarters show that the rate of dowry oppression against women has gradually increased up to 2003 and it also experienced a sudden decline in 2004 and again increased in the following year. Further research is needed to establish the reason for the sudden decline and the re-surgence thereafter. More data is needed, but unavailable at this stage to establish whether the trends in the future is to decline in response to the new laws and the new policy called "gender mainstreaming". The argument developed here is that laws and the policies are not implemented in a consistent manner and that this is the reason why there was initially a decrease when the law changed, but when implementation was tardy, the practice of abuse of women's rights continued.

Many studies (Siddique, 2000; Khan 2001, Mannan 2004, Jahid 2004, Rozario 2004, Naripokkho 1998) have been conducted to find out the factors responsible for the dowry practice. The study will try to apply the social relation approach: institutional analysis for finding a relationship among the institutions. The social relation approach divides the institution into four different categories. The following table categories of issues responsible for the dowry practices in the country based on social relation approach developed by Kabeer.

Table 3: Factors Responsible for Producing, Reinforcing and Reproducing Dowry

Key Institution Location	Factors responsible producing, reinforcing, and reproducing the dowry
State (legal, military, administrative organizations)	Siddique (2000) reveals some limitations of judiciary
	Khan (2001, p. 124) focuses on the limitation of legal definition of dowry given in existing laws of the country
	Naripokkho (undated, pp. 34-38) blames the negative and disrespectful attitude of police towards women, gender biases among judicial officers, difficulties of access for women, lack of evidence, lack of security of witnesses, lengthy procedures, inadequate shelters and poor level of care and services in existing shelters, lack of counselling services and lack of proper investigations.
	Jahid (2004, p. 1) and Hayward (2000, p. 102) blame the high cost and corruption in the legal system.
Market (firms, financial corporation, farming enterprise and multinational so on)	Suran et al (2004, p. 4) holds responsible hyper gamy among the bride's family to raise their status by marrying the daughter into a higher status family
	Nazneen (2004, pp. 12-13) states that dowry is a status symbol in the society.
	Rozario (2004, p.33), Hayward (2000, p. 101), Khan (2001, pp. 123-24) and others identify economic reason for dowry. They accuse the increase of capitalist value, materialism, and the job market for dowry.
Community (village tribunals, Voluntary associations, information, patron client relationship, NGOs	Rozario (2004, p. 33) and Nazneen (2004, p. 13) identify that marriage squeeze for dowry practice in the society.
	Schuler, Hashemi,and Badal (1998, p. 150)blames social dependency of women is a factor contribute to the dowry practice.
Family/ kinship	Rozario (2004, p.) also accuses the patriarchical attitude in the family responsible for dowry.
	Rozario (2004, p. 31) identifies the social vulnerability of women and marriage as a major factor responsible for dowry.

The above table shows that the institutions are not ideologically neutral and they are the cause of producing, reinforcing and reproducing social inequalities. The interrelatedness of the institution reinforces and reproduces the dowry practice and causes increasing rate of violence. The

five aspects of social relations shared by institutions can also be helpful for analyzing the practice. Rules allow male to take everyday decision, Social norms, values, laws, traditions and customs are in favour of the patriarchical attitude that places women in a inferior position. The gender division of labour decided women to do the household work and assign with activities that are regarded as less important. The resource distribution in the society is also in favour of men. Property is inherited by the male member of the country family. Despite the existing legal property rights women are deprived of their shares from their parent's property. Thus the five basic aspects of the institutions are becoming a key issue for the reinforcing the dowry practice.

Five Aspects of Social Relations Shared by Institutions

Rules: The framework identifies two types of rules i.e. official or unofficial (norms, values, laws, traditions, customs) that permit everyday decisions to be made with the minimum of effort. With the change in the social system the state has failed to provide enough support for women to cope up with the changing situation. The challenges of the new world have triggered the vulnerability of women. For example, man's and women's jobs are not equally recognized by the family and society. Women are less paid for the same job in some cases. Even if a woman earns equally in a family, her contribution is valued less by the member of the family. Studies show that even women paying dowry have to face more violence. It is not considered as an equally valued contribution for the family. Sometimes, it even increases lured for dowry.

Activities: The traditional division of labour involves man and women to perform particular task that is attached with reward. Earlier this highly agriculture-based society depended on their female family members for agricultural food processing and other related activities. The increasing trend of landlessness had a direct impact on the households and economy and it further reduces the women's positions in the families. Besides, children were considered as a very significant resource for a family. With the expansion of market and increasing rate of cost of living, it has become quite difficult for a family to maintain children. Reproductive work is now becoming a less valued activity. The government and even the families consider more than one or two children as burden for the family. This change in the social system has devalued the traditional role of women in the family, market and state.

Resources: As it is considered that the men's responsibility is to feed the family, men are given privileged access to resources such as land and other properties. Existing laws such as inheritance laws provide half share for daughters. Still this is not implemented. Women are deprived from their due share as daughters and there are values that women shouldn't claim their shares. Thus, the concentration of resources at men's hand makes women more vulnerable.

People and power: Men are in the upper position of the hierarchy in different situations. It regulates the policy making and policy implementation in institutions.

Kabeer stated (1994 cited in March, Smyth, and Mukhapadhyay 1999. pp.104-109) that the unequal distribution of resources and responsibilities, together with the official and unofficial rules which promote and legitimise this distribution, ensures that some institutional actors have authority and control over others. These individuals then promote practices which entrench their privileged position, and they are most likely to resist change. Therefore, modernization fails to reduce dowry practice in the country moreover it has provided some extra fuel to accelerate the situation.

5.0 Conclusion and Recommendations

Dowry is not a new phenomenon in the Indian subcontinent, but the practice taking place today is in different form. It was confined among the Holy caste Brahmin as a symbol of status. Now it is widely practised among the Muslims in the subcontinent causing much violence against women.The inflation of dowry practice, the violence and brutality caused by it has raised the concern of the government and other organizations. But all approaches to stopping dowry have not proved effective yet. Perhaps the problem needs to be addressed differently by working with many stakeholders and organisations across the public and community sectors. Society also needs to become more effective in enforcing our legal and other policy approaches. This requires a change in values. It is not easy to draw a definitive conclusion on such a large scale problem based on such a small scale study. Nevertheless I would like to provide some recommendations, based on the study of secondary data.

Recommendations include:

a) Changing the Existing Law

Legal drawbacks for dowry practice and dowry violence in Bangladesh include the legal definition of dowry. I agree with others (Nangia 1997, pp. 656-661; Umar 1998, p. 273; Banerjee 1997; Hitchcock 2001 cited in Kaushik 2003, p. 111) that the definition of dowry should further clarify the "in connection with marriage" requirement as sometimes the dowry demand does not have any connection with marriage. The law needs to be reformed to include "expected" gifts. It is difficult to distinguish what is dowry and what is gift. The custom of giving and receiving gifts becomes a problem in stopping dowry practice in society. Considering the evil of dowry practice we need to think about stopping the custom of giving and receiving gifts. The lust for luxurious gifts is also causing trouble in conjugal life. Besides, there is no provision for compensation for dowry violence to women or their families in Bangladesh. We have to have compensation for women for injury caused by violence and social dishonour. The provision of compensation can prevent the practice and violence in society.

b) Strengthening the Support System

Compared to the magnitude of dowry practice and violence the support service is very limited. There should be more support service centres and shelter house for abused women in every lowest unit of field administration.

c) A Legal Body to Implement Inheritance Law

As mentioned earlier, some claim that dowry has a relation with inheritance, although even those who do not have property face dowry demands and dowry violence. However, we need to establish the property rights for women. The existing law should be implemented. Most of the problems with property arise when the daughter claims it and the parents don't want to give them the property. Nevertheless, the government can take initiative to distribute the property among the heirs after the death of the parents or whenever necessary. A legal body can be set up to do the work on behalf of the parents and ensure justice and implementation of the existing law.

d) Strengthening Social Networks

A social network developed with the state and civil society could be implemented. A strong network among the eligible unmarried and married women can help them handle dowry. The government could provide patronage for such a network. Networks could be strengthened by working with religious leaders and addressing values. Dowry was not a custom among the Muslims in Bangladesh and it is not even allowed by their religion. The religious leaders of the community can participate in the anti-dowry movement.

References

Anderson, S 2003, 'Why dowry payments decline with modernization in Europe but are rising in India', Journal of Political Economy, vol. 111, no. 2, pp. 269-310.

Banerjee, P 1996, Bride burning and dowry deaths in India, viewed 26 May 2006, <http://www.hindunet.org/srh_home/1996_2/msg00193.html>.

Bangladesh National Women Lawyers' Association 2004, Violence against women in Bangladesh 2003, Bangladesh National Women Lawyers' Association, Dhaka.

Bhat, PN & Halli, SS 1999, 'Demography of bride price and dowry: causes and consequences of the India marriage squeeze, Population Studies, vol. 53, pp. 129-148.

Department of Women and Child Development 1997, Dowry statistics, Ministry of Human Resource Development, Government of India, viewed 11 July 2006, <http://www.hsph.harvard.edu/Organizations/grhf/SAsia/resources/dowry/statistics.html (11>.

Eisenstein, Z 2004, Against empire: feminism, racism, and the West, Zed Books, London.

Hayward, RF 2000, Breaking the earthenware jar: lesson from South Asia to end violence against women and girls, UNICEF, Kathmandu.

Hartmann, B. and Boyce, J K 1990, A Quite Violence: View from a Bangladesh village, University press ltd, Dhaka

Jahid, D. 2004, 'Shalish? Mediation in rural Bangladesh, News from Bangladesh, Canada, viewed 24 May, 2005, <http://www.bangladesh-web.com/news/view.php?hidDate=2004-12-07&hidType=HIG >.

Kaushik, S T 2003, 'The essential nexus between transformative laws and culture: the ineffectiveness of dowry prohibition laws of India', Santa Clara Journal of International Law, vol. 1, pp. 74-117, viewed July 25, 2006 <www.scu.edu/scjil/archive/v1_kaushikarticle.pdf>.

Khan, SR 2001, 'The Socio-legal status of Bangali women in Bangladesh, University Press Limited, Dhaka.

Lindenbaum, S 1981, 'Implications for women of changing marriage transactions in Bangladesh', Studies in Family Planning, vol.12, no. 11, pp. 394-401.

Mannan, MA 2003, 'Neither freedom nor choice: a study of wife abuse in rural Bangladesh', Forum on Women in Security and International Affairs, Bangladesh Freedom Foundation, Dhaka.

Mannan, MA 2005, Violence against women: marital violence in rural Bangladesh, Centre for Policy Dialogue, Bangladesh, viewed 23 May, 2005 <http://www.Cpd-Bangladesh.Org/Publications/Cunfpa20.Html>.

March, C, Smyth, I & Mukhapadhyay, M\ 1999, A guide to gender-analysis frameworks, Oxfam, Great Britain.

Ministry of Foreign Affairs, Government of Bangladesh 2005, Say NO to dowry, Reiko Printing & Packaging, Dhaka.

My Nation n.d., Dowry, viewed 15 March 2006, <http://mynation.net/dowry.htm>.

Naripokkho and Bangladesh Mahila Parishad n.d., Baseline report: violence against women in Bangladesh, International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia, viewed 26 May 2006, <http://iwraw-ap.org/aboutus/pdf/FPvaw.pdf #search='Baseline%20Report%20Violence%20against%20Women %20in%20Bangladesh%2C%20International%20Women%E2%80 %99s%20Rights%20Action%20Watch%20Asia>.

Nazeen, S 2004, Gender relations in Bangladesh: the household and beyond dowry, women's property rights and salish, CARE Bangladesh, Dhaka.

Rozario, ST 2004, Building solidarity against patriarchy, CARE Bangladesh.

Rudd, J 2001. Dowry-murder - an example of violence against women, Women's Studies International Forum, vol. 24. no. 5, pp. 513-522.

Saleh, H 2004, Suggestions for addressing dowry violence, Senior Project 2004, American International School, Dhaka, viewed 17 May 2005, <http://www.ais-dhaka.net/School_Library/Senior% 20Projects/ 04_Saleh_dowry.pdf#search='dowry% 20violencehamida%20saleh>.

Shirnivasan, P & Lee, GR 2004, 'The dowry system in Northern India: women's attitudes and social change', Journal of Marriage and Family, vol. 66, no. 5, pp. 1108-1117.

Sitaraman, B 1999, 'Law as ideology: women, courts and dowry deaths in India', International Journal of the Sociology of Law, vol. 27, no. 3, pp. 287-316.

Suran, L, Amin, S, Huq, L & Chowdury, K 2004, Does dowry improve life for brides? A test of the bequest theory of dowry in rural Bangladesh, Population Council Working Paper, Policy Research Division, The Population Council viewed 15 June 2005, <http://www.hri.ca/fortherecord2001/vol3/bangladeshtr.htm>.

The Hunger Project 2005, A strategic organization for the end of world hunger, viewed 26 May 2006, <http://www.thp.org/>.

Women for Women 2001, Stop violence against women, Unpublished paper prepared by Women for Women, A study and research group, Dhaka.

Women for Women 2002, International conference on dowry; realities & strategies for intervention: working together for challenge in the 21st century, Women for Women, A Research and study group, Dhaka.

Shirnivasan, P & Lee, GR 2004, 'The dowry system in Northern India: women's attitudes and social change', Journal of Marriage and Family, vol. 66, no. 5, pp. 1108-1117.

Sitaraman, B 1999, 'Law as ideology: women, courts and dowry deaths in India', International Journal of the Sociology of Law, vol. 27, no. 3, pp. 287-316.

Suran, L, Amin, S, Huq, L & Chowdury, K 2004, Does dowry improve life for brides? A test of the bequest theory of dowry in rural Bangladesh, Population Council Working Paper, Policy Research Division, The Population Council viewed 15 June 2005, <http://www.hri.ca/fortherecord2001/vol3/bangladeshtr.htm>.

The Hunger Project 2005, A strategic organization for the end of world hunger, viewed 26 May 2006, <http://www.thp.org/>.

Women for Women 2001, Stop violence against women, Unpublished paper prepared by Women for Women, A study and research group, Dhaka.

Women for Women 2002, International conference on dowry; realities & strategies for intervention: working together for challenge in the 21st century, Women for Women, A Research and study group, Dhaka.

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
ঊনচত্বারিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৬/জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

The RMG Sector - An Investigation into the Tripartite MoU for Betterment of the Sector & Its Workforce

Shyamal Kanti Ghosh *

***Abstract**: One of the most promising industrial sectors of Bangladesh is the Readymade Garments (RMG) sector, which is important both in terms of employment and export earnings. The sector plays an important role in the overall economic development of our country. At present approximately 25 lakh workers (among which 80% is female) are working in this sector, which is a great source of employment. Considering the other business activities associated with RMG, the number of people indirectly employed in this sector ranges between 10 to 20 million. This is unquestionably a colossal employment market for an economy afflicted with the classical syndrome of unemployment and poverty. Apart from the quantity of foreign exchange it earns, the garment sector should occupy the centre stage of national priorities also for the sheer size of the employment market under its command. The objectives of this study are to assess compliance of the MoU for the betterment of the RMG sector; and to suggest some measures helpful for creating an atmosphere for boost up of the sector and smooth foreign exchange earnings for the country. Further, the study, observng the overall perspective of mitigating labour unrest in the RMG sector in compliance with the MoU, come up with some suggestive measures which could be of assistance to this vital sector perform better if those are taken into action.*

1.0 Introduction

One of the most promising industrial sectors of Bangladesh is the Readymade Garments (RMG) sector, which is important both in terms of employment and export earnings. The sector is featured by the presence of a staggering labour intensive mode of production with a colossal role in the empowerment of women and elimination of poverty. The envious growth of this industry during the last two and half decades bestowed the country and its workforce (most of them are women) an image boost around the world. In 1979m there were 9 export-oriented RMG units in the country generating export revenue of less than one million dollars. By 2005/6, the number of factories rose to more than 4,300 with an export income of more than US$ 8.0 billion (Hussain, Md. Ghulam 2006).

* Director General, Directorate of Primary Education, Dhaka, Bangladesh

The sector plays an important role in the overall economic development of our country. At present approximately 25 lakh workers (among which 80% is female) are working in this sector, which is a great source of employment. It is also mentionable that about 76% of our foreign exchange is also earned by this sector. But after elimination of quota under MFA, Bangladesh does not have the protected market any more. With the collapse of Savar Spectrum Garment factory the issues of Social Compliance has become a burning issue in this sector and lots of pressure have been imposed on the industry proprietors as well as on the government regarding the safety of workers and their overall welfare. The safety of the workers has become a national issue.

This sector alone contributes to more than 81 per cent of the growth in the value of country's export over the past 22 years between 1984 and 2006. It may be worthwhile to note that in early eighties when garments sector emerged as a stakeholder on the industrial map of Bangladesh, its contribution to export earning was only 10 per cent. Compared to that modest beginning, at present it accounts for about 76 per cent share of the country's total foreign exchange earning through export. It is in itself a huge achievement for a single sub-sector under the manufacturing sector. It accounts for 25 per cent of the total value added in manufacturing, while its share in the Gross Domestic Product (GDP) is 17 per cent. The impact of this sector on the economy is also huge and diversified. Various sectors of the economy including transport, distribution of goods, services and construction activities have been receiving the desired boost from the sector. If one views only the scenario of industrial employment in the country, it would be found that the garment has appeared as the single largest provider of blue collar jobs in the economy at 40 per cent of the total workforce in manufacturing. Considering the other business activities associated with RMG, the number of people directly employed in this sector ranges between 10 to 20 million. This is unquestionably a colossal employment market for an economy afflicted with the classical syndrome of unemployment and poverty. Apart from the quantity of foreign exchange it earns, the garment sector should occupy the centre stage of national priorities also for the sheer size of the employment market under its command (The Financial Express -Tuesday July 10 2007).

1.1 Objectives of the Study

The specific objective of the study is to assess compliances of the MoU

for the betterment of the RMG sector; and the other objective is to -

• suggest some measures helpful for creating an atmosphere for boost up of the sector and smooth foreign exchange earnings for the country.

1.2 Rationale of the Study

In current circumstances, to square up the problems prevailing in the sector and the threats coming from the competitors there are some musts ahead of us - not only the markets niches abroad; the jobs of millions of workers have also to be saved. The recent unrest in the RMG units in and around the capital city is an issue the government as well as the direct stakeholder in the RMG sector must take seriously. As is well known, the unrest has a lot to do with the demands for pay raise of the workers, existing safety standards in the factories and the overall condition of work. The media continues to cover reports of sporadic eruption of turbulence in the garment units.

1.3 Methodology

a. Review the status of compliances with national and international standards for pre-MoU period.

b. Focus on the outbursts of labour unrest.

c. Both primary and secondary data have been used here to evaluate the compliances with the MoU.

d. The primary data were collected from sample survey.

e. A set of indicator was used to evaluate compliances.

f. Results have been analyzed with traditional statistical means.

1.4 Scope and Limitations

The study covers -

i) overview of the RMG sector;

ii) its mitigation approaches which includes the tripartite MoU, implementation of its clauses along with compliance monitoring; and

iii) recommending measures based on the findings come out from the study.

The study also tries to focus on the well-beings of the workforce involved

from a broader perspective and does not, rationally, cover the total length of this huge work environ.

1.5 Plan of Presentation

The paper consists of five chapters. The introductory one encompasses the overview of the RMG sector in brief. Chapter II accommodates the burning issue of the sector that is, labour unrest and its reasons and the tripartite MoU signed to mitigate the problem. The third chapter examines the MoU itself, how it is being exercised, monitoring mechanisms etc. The fourth and fifth chapters provide the findings and concluding statement along with suggestive measures respectively.

2.0 Recent Labour Unrest

2.1 The months of May and June 2006 have witnessed series of rebellious incidences in the garments sector of Bangladesh. On May 3, garment workers and supporters staged a peaceful protest against a sudden wage cut by the management of EPZ. The management of Ring Shine called in the police. There were clashes between the workers and the police that left two persons (one worker and one supporter) dead and about 200 injured. Outraged demonstrators ransacked the factory in vengeance. 6 persons were arrested, and another 80 face charges of property damage.

Outside EPZ, the labour insurgency started on May 20 at FS Sweater Factory in Shripur under Gazipur district. Workers gathered and refused to work unless 3 fellow workers were released from custody. The factory management reportedly locked the workers in the factory. The workers fought their way out and barricaded the Dhaka-Mymensingh highway for 6 hours and fought pitched battles with cops. One worker was killed and 70 left injured.

On May 22 workers of Universal Garments Limited gathered to demand 3 months arrear wages but were pushed "back by the factory security staff. In retaliation, the workers went to neighbouring factories and sought their supports. Several thousand workers joined the possession. 2 factories were torched and 100 more ransacked, over 300 company and management vehicles wrecked. The highways were blocked. Media reports stated that some thousands unruly people mostly outsiders stormed the Bando Design Enterprise at Savar EPZ on May 22 and damaged machine, motor vehicles and furniture holding innocent

workers hostage. May 23 started with attack on Little Star Spinning Mills Limited. The revolt then spread to more factories and industrial areas of Dhaka were closed. Workers took the revolt from the industrial suburbs, where factories were being looted, destroying cars and attacking commercial buildings. The two days long reign of terror was let loose by the unruly elements in different industrial belts in and around Dhaka including Savar, Ashulia, Tongi, Mirpur, Uttara, Tejgaon, Gazipur and Rupgonj that left over 300 factories damaged and 19 others burnt. Mass demonstrations demanded an end to / repression, release of arrested workers, higher minimum wages, weekly holidays, overtime pay, public holidays, payment of arrear wages, etc. Throughout June, clashes in the garment producing areas have continued, the main issues being victimization of militants, and non-implementation of previously agreed concessions. Strikes continually break out at individual factories, workers nearby stop work to join the spontaneous demonstrations. The owners blame foreign conspiracy, but apparently appeared eccentric and phoney. In any case, nobody could deny the fact that the current spate of agitation relates to compliance also.

Although there exists more than 40 union representing garments workers, the level of unionization among workers is very poor ILO commissioned survey narrated that most trade unions in the garment sector operated from outside the factories and they lack wholesale active participation of the general workers. The survey says that there is also need to improve the institutional capacity of basic unions and industrial federations in this sector to deliver effective membership services and more transparent and responsible actions by the union leadership. Violence in workplaces is not desirable. The recent turmoil also indicates that the garments workers need to be organized and engaged in systematic bargaining. The deliberate discouragement by the owners to form unions inside the factories deprives them from nominating collective bargaining agents.

According to a report of government enquiry committee, the main reasons of the two days violence and vandalism at different garment factories on May 22 and 23 are: (a) absence of working atmosphere, (b) violation in payment of workers' wages as per minimum wage structures fixed by the government, (c) irregular payment of wages with other financial benefits like overtime; (d) resorting to dillydally tactics by a section of employer to pay compensation to the families of the workers

killed in accidents; and (e) indecent behaviour of a section of officials (mid-level management) to deal with the workers, etc. The enquiry committee recommended ensuring of job security, regular payment of wages, revision and implementation of minimum wages and necessary measures to resist accidents and ensure safety and security of the workers to address the problems and labour unrest in the garments sector.

2.2 Following the unrest, the factory owners at a tripartite meeting accepted almost all demands of the garments workers including the right to form trade unions, weekly holidays, maternity leave and issuance of appointment letters and identity cards. The meeting formed a minimum wage board comprising representatives from the government, factory owners and workers. And a formal memorandum of understanding (MoU) was signed on June 12, 2006 between the Government, RMG associations and labour unions; in which the following 10 issues were mutually agreed upon:

1) strongly condemning the unwanted incidents that took place in different locations resulting in loss of properties, etc., all of them expressed their sorrow and an unanimous decision was taken to stop such incidents immediately;
2) to withdraw the police cases that were filed against the workers in Gazipur, Tongi, Savar and Ashulia police stations who were involved in the turmoil;
3) workers involved in the movement will not lose their jobs;
4) in order to return to the normal situation, the factories that were closed due to the unrests should resume operations immediately;
5) all workers will be provided with letters of employment and identity cards;
6) no restrictions shall be imposed on the trade union activities and on the right to bargain;
7) as per as the existing labour laws, all workers should be entitled to a one day leave per week. Also, as per as the existing labour laws, all due leave to the workers should be ensured;
8) if the workers have to work more than 8 hours per day, they will be given overtime payments;
9) as per as the existing labour laws, maternity leave should be given with full pay; and

10) to review and revise the existing wage structure, a minimum wage fixation board will be formed.

2.3 Having signed the tripartite agreement (MOU) among government, exporters associations and the trade union federations on 12 June 2006, both BGMEA and BKMEA have assigned responsibility of collecting information on. the 10 points of the MOU to their own monitoring teams. BGMEA conducted inspections in 2,893 factories during the period from 18 July 2006 to 10 August 2006 and 3 September 2006 to 15 October 2006. Information received from BGMEA reveal that more than three-fourths of the inspected factories have issued appointment letters to the workers, more than 90 percent enterprises are providing different leaves and weekly holidays, 75 percent are providing maternity leaves with admissible benefits and more than 81 percent factories are paying overtime allowances regularly.

2.4 Causes of Recent Labour Unrest

Apparently general causes of labour unrest are the follows

a) insufficient training and motivational programme by few enterprises;
b) increase of living cost of the workers;
c) hiring and firing tendency by few enterprises;
d) lack of individual attitude among the workers and investors:
e) weak internal security system of the enterprises;
f) inefficient mid level management ;
g) inadequate wage and overtime and remuneration;
h) piece rate in sweater factory;
i) service insecurity;
j) absence of leave; and
k) absence of maternity benefit.

2.5 The Follow-up of Unrest incidences and the MoU

The unprecedented May 2006 labour unrest has forced the Ministry of Labour and Employment (ML&E) to switch over her focus from monitoring the progress on compliance activities to the implementation of the 10-points tripartite MOU reached on 12 June 2006 between the Government, workers and the owners. To monitor the implementation of these 10 points, Ministry of Labour and Employment has taken following steps:

(a) created 15 inspection teams - 10 for Dhaka region and 5 for Chittagong region;

(b) each team is composed of representatives from Labour Department and Factory Inspection & Establishment Department;

(c) these teams check and collect information on 8 (eight) aspects at the factory level as follows:

(i) whether appointment letter has been issued;
(ii) whether identity card has been given to workers;
(iii) whether workers allowed to enjoy weekly holidays;
(iv) whether minimum lowest wage is paid to workers;
(v) whether wages are paid regularly;
(vi) whether workers are required to work overtime;
(vii) whether overtime allowances are paid; and
(viii) whether workers are allowed to enjoy maternity leave.

(d) inspected garments factories have been grouped as (a) compliant (fulfilment of all conditions), (b) semi-compliant (non-fulfilment of only one condition) and © non-compliant (non-fulfilment of two or more conditions) factories based on their level of compliance of the major provisions of the Labour Law;

3.0 Compliances as Regards the RMG Sector

3.1 What is Compliance?

Compliance is the maintenance of certain recognized standards. It is a code of conduct that takes into account minimum labour standards, occupational safety measures and environmental concerns. Minimum labour standards cover wages, working hours, over time, safety, job security, right to form trade union, and also social security. It also ensures non-violation of human rights. Social benefits are socially responsible management which includes bonus, cash incentive, working condition, maternity leave, medical facilities, arrangement for food including safe drinking water, prayer place, transportation, festival bonus, etc. Compliance and productivity have close relations, because without good working conditions, minimum wage, etc., the workers can not be expected to improve their skill to produce more or quality products.

3.2 Why is Compliance so Important?

The allegation on working conditions and environment against the RMG industry \N o does not have any boundary. These include, inter alia, wages are low, hours are long, forced labour is practised, overtime bills are not met, payments are irregular, child labour exists, sexual harassment exists, freedom is curtailed, entries are locked, and multitude of other practices which are termed to go against international labour standards and codes of conduct. At the level of legislation and business dealings, lack of enforcement of laws, restrictive laws, and unfair buying practices by the buyers compound the issue of non-compliance. "

3.3 Problems of Compliance

Compliance does carry some inherent risks and additional costs for the industry. Experiences with the elimination of child labour from Bangladesh RMG industry reveal that compliance initiatives are not necessarily and properly remunerated by the buyers. There are about one thousand buyers operating in Bangladesh. The compliance requirements among these buyers vary widely and most buyers have their own set of codes. These codes are also changing. Many factories have multiple buyer orders running at the same time, making it difficult for producers to always comply with buyer requirements (Iftekar, 2005).The problems associated with compliance in Bangladesh may be grouped as (a) regulatory inadequacies; (b) non-enforcement: oLJgwjJI-fc) 'ack of adequate physical facilities and governance, and (d) other problems.

3.4 Regulatory Inadequacy

Different workers' organizations and the civil society (as well as buyers) have been asking for removal of inadequacies in respect of working hours, night law, overtime, method of calculation of overtime, etc. The new Labour Law allows maximum 60 hours including additional 12 hours overtime per week. Many RMG firms find this working hour is not sufficient to meet peak season delivery deadlines (Murshid et al, 2003). However, the new law attempts to ease the ambiguity with respect to the method of calculation of overtime. According to Section 108 of the Bangladesh Labour Law 2006, the overtime shall be twice the basic wage plus dearness allowances and ad hoc wage, if any. Section 109 of the Law stipulates that a female worker can not be asked to work from 10.00 PM to 6.00 AM without her consent. Stipulation to provide appointment

letters and identity cards to the workers under Section 5 is a welcome insertion in the Law.

3.5 Poor Enforcement of Laws

It has been mentioned that Bangladesh had 25 labour related laws in force till 11 October 2006. An apparent lack of consistencies and clarities among these laws made their enforcement cumbersome and weak. While admitting the fact that updating and reconciliation of the existing laws are very useful in improving the overall regulatory environment for compliance, the presence of well trained, honest and dedicated inspection machinery is also needed to enforce them. I Proper enforcement of law can help the industry meet at least 80 percent of the requirements of the international compliance practices, observed in the last UNDP-MFA Forum international conference held in Dhaka during June 2-3, 2006.

Their implementation. It also contains information on the compliance requirements of the Basic Social Compliance Initiatives (a retailers' association in Europe), compliance requirements of major European buyers, requirements of North American buyers, provisions of ILO convention, etc. A similar attempt has also been taken by BGMEA. London based International MFA Forum has prepared a draft Jo-In code for Bangladesh RMG industry.

Meanwhile, the government has enacted the "Bangladesh Labour Law 2006", reconciling as many as 25 laws and regulations on labour related affairs. Bangladesh has ratified seven out of eight core ILO conventions. Despite all these efforts, there are some pertinent questions that need to be addressed.

3.6 Other Problems

Other serious problems having indirect bearing to factory standard and compliance are frequent disruption in power supply forcing the workers to do overtime, absence of workers' organizations (unions) inside most factories, a weak and ineffective mid-level management, an apparent lack of knowledge and awareness among the workers of their rights and entitlements and non-existence of any premium or incentive for becoming compliant. As compliance has a cost, this absence of any premium may be attributed to the sluggish growth of compliant industries. Despite these, it is graduating as compliant every day. Becoming compliant with social and labour standards.

3.7 Compliance Practices in Bangladesh

Bangladesh's record on compliance and standard in general is poor, although the °RMG industry has registered remarkable improvement in recent times. Most of the studies conducted have shown that violation of the laws has been extensive in the RMG industry. Adherence to internationally recognized core labour standards has appeared to be modest although Bangladesh has ratified seven out of eight ILO conventions relating to workers.

Several studies reveal that the owners exploited the abundance and unskilled position of the workers. Reports on unnoticed dismissals or illegal terminations resulting to conflicts are not uncommon. Also there are reports of deprivation of severance benefits to the workers. Absence of any legal contract has produced conflicts between the workers and the owners.

As there had no legal bindings for the factory owners to issue appointment letters, they usually did not issue that. Section 5 of the recently enacted Bangladesh Labour Law 2006 has made issuance of appointment letters and identity cards to the workers mandatory. This will definitely bring about much desired sense of security in the workplaces.

The Minimum Wage Ordinance 1994 fixes the minimum wage at Taka 930 only and this remained unchanged for about 12 years. There were reports in the media that even this minimum wage was not religiously enforced. Section 139 of the labour law 2006 provides that the minimum wage may be revised in five years. It also says that the government may revise the minimum wage upon receipt of a request from the owners or workers or jointly from them. Minimum wage was also point of MOU.

The Factory Act 1965 allows factories to operate six days a week and 12 hours a day including overtime. The weekly holiday is on Friday. The Act provides women to work overtime up until 8.0 o'clock at night. The Act also provides that no worker should be forced to work for six hours at a stretch without an hour's break or two half-hour breaks. Several studies reported information violating the above mentioned provisions of the law (Jamaly & Wickramanayake, 1996). To meet delivery deadlines, workers are often forced to work beyond 8 o'clock in the night, or asked to work throughout the week without a day off. It is true that often workers show interest to work overtime for extra income. Nevertheless, it is not

necessarily rewarding for the owner as he faces delivery deadlines associated with excessive dependence on imported raw materials, frequent disruption in electricity supply, political unrest, inefficiency of the port and customs, weak infrastructure, poor governance, red tape and corruption, etc. force him to resort to continue works in contravention of the provisions of the Law. Poor or almost non-existence of enforcement also encourages the owners to disregard the law.

Many criticize the provision of leave for the workers are nominal while compared with leave available for a government servant. According to Sections 78 to 81 of the Bangladesh Labour Law 2006, in addition to weekly holidays, workers are entitled to enjoy different types of leaves that include 20 days annual leave with wages, 10 days festival holidays, 10 days casual leave on full pay, 14 days sick leave on half pay, (8+8=16) weeks maternity leave, etc. The government has extended the period of maternity leave from 12 to 16 weeks in Section 46 of the Bangladesh Labour Law 2006.

3.8 Evolving Buyers' Preferences

Although there exist no prohibitions in forming workers' unions in the factory, in reality, the factory managements do not encourage such activity of the workers. As a result, there exists apprehension among the workers of losing jobs should the management become displeased for joining unions. There are around 40 registered workers' associations in the country, and they hardly possess any common understanding. There exists a common fear among the owners about the unions that these are highly politicized and often militant.

In addition to the issues mentioned above, in many a cases, workers are not aware of their rights and responsibilities. The May 2006 turmoil in the RMG sector is attributable to the discontent prevalent among the general workers with regard to wages, overtime, leave, etc. On the top of these, the mid-level management has been identified as a serious hindrance to establishing a healthy working atmosphere inside the factory.

4.0 Analysis & Findings

4.1 As a result of the tripartite MoU, to combat the Labour unrest in RMG industries, labour unrest and their movement were neutralized. Thereafter, the consequences of the movement entirely depend on the successful implementation or compliance of the MoU. For this reason,

the Ministry of Labour and Employment (MOLE) took following measures:

1. Instantly 15 inspection teams (10 for Dhaka division and 5 for Chittagong division) were formed under the Notification of MOLE bearing memo no. k"IKg/kv-6/cwi`k©b-1/2006/54 ZvwiL-29 ˆR¨ô 1413/12 Ryb 2006 for monitoring the compliance of MoU;
2. To determine the minimum wage for Labour, the Wage Board constituted earlier was requested to minimum wage for the RMG sector labourer.. Accordingly, the Wage Board determined the minimum wage at the rate of Tk. 1662.50 per month instead of Tk. 930.00.

On the other hand, the association of employers BGMEA and BKMEA also took the following measures for implementing or compliance of the said MoU:

1. Not to remove any labour on the ground of movement.
2. To ensure their own monitoring system to achieve the complience.
3. To resume operations of all factories, those were closed due to unrest.
4. To withdraw the police case against the labour.
5. To issue the appointment letter to the labour.
6. To provide the identity card to the labour.
7. To ensure weekly holiday.
8. To pay minimum wage at rate Tk. 1662.50 on a regular basis.
9. To ensure maternity leave for female labour.

Subsequently, The Bangladesh Labour Law 2006 (Act 42 of 2006) was enacted with immediate effect as compliance with the MoU. There are so many sections there that can contribute to meet the goal.

Therefore, an assessment has been made to evaluate the degree of compliance of the MoU in this study. With a view to evaluate the degree of compliance, the following 8 assessment indicators have been determined.

(i) whether appointment letter is to be issued;
(ii) whether identity card is to be given to the worker;
(iii) whether weekly holiday is to be ensured to the worker;
(iv) whether minimum wage is to be paid to the worker;
(v) whether the wage is to be paid regularly;

(vi) whether worker is to be involved in overtime work;

(vii) whether overtime allowance is to be paid to the worker on regular basis; and

(viii) whether maternity leave is to be ensured to the worker.

The above mentioned inspection team made their primary visit in 1523 factories of Dhaka and 463 factories of Chittagong with in June to October 2006 and also made their follow up visit in 50 of Dhaka and 389 of Chittagong with in March to July 2007. The team obtained the information from their inspection regarding the compliance of MoU based on the above indicators on basis of a binary response either 'yes' or 'no' of a respondent labour or a management personnel. The information obtained from visited factories against indicators is shown in Table -1 and Table - 2 (annexed at the end).

4.2 Findings

The compliance of MoU for a factory was evaluated in 3 ways: - 1) If each response for a factory against 8 indicators is 'yes', the factory is fully compliant. 2) If any two responses for a factory against any two indicators are 'No', the factory is partially or semi-complaint. 3) In case of more than two responses are 'No', the factory is non-compliant with MoU.

It is observed from the primary visit that 18.0 % factories in Dhaka Division and 19.8% in Chittagong Division are non-compliant, on the other hand, 30.0% in Dhaka and 35.0% in Chittagong are complaint. In a follow up visit, it is found that 6.0% in Dhaka and 23.4% in Chittagong are non-compliant, on the other hand, 66.0% in Dhaka and 54.0% in Chittagong are compliant.

Therefore, it may be concluded that any factory, which is compliant with MoU, may be a non-compliant one in any time in absence of proper monitoring.

5.0 Recommendation & Conclusion

5.1 Recommendations

The study, observing the overall perspective of mitigating labour unrest in the RMG sector in compliance with the MoU, comes up with the following recommendations:

- Monitoring system should be more intensive;
- Worker and management relation should be developed.
- Continuous training program workers and mid level managers should be ensure;
- Worker should be motivated that there also be part of the industry;
- Awareness build up training should be imparted;
- Participation committee should be from and meet once in a week;
- Some welfare schemes (Scholarship for the children facilities, low cost housing, Medical facilities etc.
- Measure should be taken to supervise to sudden super vision of the motoring team.

5.2 Conclusion

Empirical findings on compliance in this sector particularly are rather outdated and irregular. These, as such, should not be treated as representative while considering the recent awakening developments that have been taken place within the industry following cessation of MFA system on the one hand, and major tragedies such as Spectrum and KTS accidents, on the other. Backed by enormous and enduring pressures from the demand side, these successive tragedies have generated an momentum for change in the RMG sector. The workers uproar of May 2006 have again brought to the fore the need for urgent and meaningful change. Apart from compliance, other burning issues such as buying practices, turnover time, infrastructural development, corruption and red tapes, development of linkage industries etc. need to be addressed simultaneously.

Table – 1

Compliance-level of RMG sector on month-wise monitoring found in first visit (Dhaka Division)

Name of Month	Inspection	Compliant	%	Semi-compliant	%	Non-compliant	%	Shifted	Closed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
June/2006 (18/6/06 to 30/6/06)	155	30	19.35	17	10.97	108	69.68	-	-	
July/2006	286	93	32.52	23	8.04	170	59.44	-	-	
August/2006	214	139	64.95	20	9.35	52	24.30	-	3	
September /2006	92	40	43.48	09	9.78	43	46.74	-	-	
October/2006	10	-	-	-	-	10	100	-	-	
November/2006	-	-		-		-		-	-	*Monitoring was suspended at this period*
December/2006	-	-		-		-		-	-	
January/2007	-	-		-		-		-	-	
February/2007	59	27	45.76	17	28.81	14	23.73	01	-	
March/2007	121	50	41.32	55	45.45	16	13.22	-	-	
April/2007	118	59	50	45	38.13	12	10.17	01	01	
May/2007	146	72	49.31	50	34.25	24	16.44	-	-	
June/2007	118	56	47.46	35	29.66	27	22.88	-	-	
Total =	**1319**	**566**	**42.91**	**271**	**20.55**	**476**	**36.09**	**02**	**04**	

Table – 2

Compliance-level of RMG sector on month-wise monitoring found in first visit (Chittagong Division)

Name of Month	Inspection	Compliant	%	Semi-compliant	%	Non-compliant	%	Shifted	Closed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
June/2006 (18/6/06 to 30/6/06)	148	80	54.05	52	35.13	16	10.08	-	-	
July/2006	209	50	23.92	89	42.58	70	34.49	-	-	
August/2006	97	31	31.95	62	63.91	04	04.12	-	-	
September /2006	09	03	33.33	04	44.44	02	22.22	-	-	
Total =	**463**	**164**	**35.42**	**207**	**44.70**	**92**	**19.87**	-	-	

Reference:

Ahmed, Iftekhar et al. (2005) Impact of Trade Changes on Labour Standards- Lessons to be Learned from the Responses to the MFA Phase out in Bangladesh, Dhaka, Bangladesh Enterprise Institute;

Chowdhury, Siddiqur Rahman & Hussain, Md. Ghulam (2005) Post MFA Issues and Challenges: Social Dimension: RMG Industry, Post MFA Regime and 'Recent work - The Bangladesh Perspective- Paper presented at the tripartite meeting organised by ILO in August 2005.

Hossain, H. Jahan et al. (1990) No Better Option? Industrial Women Workers in Bangladesh, Dhaka, University Press Ltd;

Kabir, Naila & Mahmud, Simeen (2004) Globalization, Gender and Poverty: Bangladeshi Women Workers in Export and Local Markets, Journal of International Development, Dhaka, 2004:

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), ১১ অক্টোবর, ২০০৬;

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন), জুলাই, ২০০৬;

বিজ্ঞপ্তি নং নিমবো/নিঃমঃনিঃ/গার্মেন্টস শিল্প/২০০৬/৩৩৮, তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ (নিম্নতম মজুরী বোর্ড এর সুপারিশ ।

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
উনচত্বারিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৬/জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক: একটি পর্যালোচনা

অদুদ রায়হান*

Abstract : *Bangladesh-Japan political relations emerged through reciprocal interest. Japan emphasises the Bangladesh-Japan political relations on the basis of its South Asian policy. In respect of Japan-Bangladesh political relations, Japan always stresses economic interest. Nevertheless political interest is not less important. In Japanese conception it is possible to ensure development through peaceful co-existence and inter-state relationship. In the context of Japan-Bangladesh political relationship Japan gives weight to U.N charter, SAARC goals and Nuclear Disarmament environment.*

ভূমিকা :

দ্রুত বিশ্বায়নের ফলে সমকালীন বিশ্বে রাষ্ট্রগুলোর পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার মধ্যে রাষ্ট্রসমূহ অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয় (Ford et al, 1976; Frankel, 1969)।[১] বহির্বিশ্বের সাথে কোনও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সাধারণত জাতীয় স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রক্তস্নাত স্বাধীনতার যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে স্থান দখল করেছে। বাংলাদেশ উৎপত্তির শুরু থেকেই অন্যদেশের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রথাগতভাবেই জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাথে এশিয়ার সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশে এবং G-৮ এর গর্বিত সদস্য জাপানের সম্পর্ক সময়ের ও রাজনৈতিক পরিক্রমায় আলোচনা করা হয়েছে।[২] ফেব্রুয়ারী ২০০২ বাংলাদেশ-জাপান কূটনৈতিক সম্পর্কের ত্রিশ বছর পূর্তি হয়েছে। তিন দশকের সম্পর্ক পর্যালোচনা দেখা যায় বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্কের যে ওঠা-নামার পর্যায় পরিলক্ষিত হয়, জাপানের ক্ষেত্রে তা একেবারেই অনুপস্থিত। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের শুরু থেকেই জাপান বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে চলেছে। দীর্ঘ দিনের এই সম্পর্ক এখন এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতা, জাতিসংঘের কার্যক্রমকে সমর্থনদান, প্যালেস্টাইন সমস্যা বিষয়ে বাংলাদেশ ও জাপানের অবস্থান এক। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রকিয়া জোরদারে জাপানের গভীর সমর্থন রয়েছে। এমনকি সাহায্যের শর্ত হিসেবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এক করে দেখা হচ্ছে।

কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য আহরণ প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাপান বাংলাদেশের সাথে কাজ করছে। কারণ এসব সমস্যা

* সহকারী অধ্যাপক, রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

জাপানকে একদিন পীড়িত করেছিল। ফলে তা দু'দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ঘনিষ্ট করে তুলেছে। বাংলাদেশের সাথে জাপানের সাংস্কৃতিক চেতনাগত সাদৃশ্য রয়েছে। বাঙ্গালীদের মতই জাপানীরা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী ও শ্রদ্ধা শীল এবং ধর্মবিষয়ে সহিষ্ণু।

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাথে এশিয়ার সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ এবং G-৮ এর গর্বিত সদস্য জাপানের সম্পর্ক সময়ের ও রাজনৈতিক পরিক্রমায় আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দাতাদেশ জাপান উদার ও সাম্প্রদায়িক চেতনামুক্ত। উভয় দেশের পতাকারই রয়েছে অনেক সাদৃশ্য, শক্তি ও মহাজাগরণের প্রতীক সূর্য শোভা পাচ্ছে দু'দেশের পতাকায়।[৩] আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন তথ্যের আলোকে বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের শাসনকালের রাজনৈতিক সম্পর্কের গতি প্রকৃতি ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে জাপানের ভূমিকা

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাপান সরকারের ভূমিকা রাখার তেমন সুযোগ ছিল না। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেই সময়ে জাপানের অবস্থানও অবশ্য বিশ্বের বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চে টোকিওর জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুযোগ তৈরি করে দেয়নি। বলা যায়, মার্কিন প্রভাব বলয়ের সরাসরি আওতাধীন থাকা অবস্থাতেই অর্থনৈতিক সাফল্য বিশ্ব রাজনীতির নতুন যে দুয়ার জাপানের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়, সত্তরের দশকের শুরুতেই সেই পথে জাপানের কেবল হাঁটি-হাঁটি পা-পা যাত্রা।[৪] ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার কোন সম্পৃক্ততা তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের সেই ঘটনাবহুল দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র, চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নেয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তার মিত্র জাপানকে কোন কিছুই পূর্বে অবহিত করেনি। এটি ছিল জাপানের জন্য দুঃখজনক অভিজ্ঞতা যা তার রাষ্ট্রীয় অবস্থানকে বিশ্বে স্পষ্ট করে তোলে। তাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণের সুযোগ জাপানী নীতি নির্ধারকদের সামনে ছিল খুবই কম। কিন্তু জাপানী সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের পক্ষে মতামত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো ছাড়াও জাপানী বিভিন্ন সংগঠন মুক্তিযুদ্ধে সরকারের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণের জন্য চাপ প্রয়োগের বিভিন্ন পন্থাও অবলম্বন করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রথম থেকেই জাপান সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রতি সরকার সবসময় সহানুভূতিশীল ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও বাস্তবসম্মত কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। বরং তাঁরা এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী জনাব আনোয়ারুল করিম মুক্তিযুদ্ধে জাপানের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন, "যদিও জাপান সরকার, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই বাংলাদেশের ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ সমস্যা বা সংঘর্ষ বলে মনে করে এবং এ বিষয়ে তাদের জড়িত হওয়া ঠিক হবে না বলে মনে করে তথাপি যখনই আমরা জাপানী কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি তখনই আমরা তাঁদের সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছি। ডায়েটের

সদস্য অথবা অন্যান্য জাপানী রাজনীতিবিদরা প্রকাশ্যভাবে আমাদের সমর্থন না করলেও কৌশলে সমর্থন দিয়েছিলেন।"[৫] জাপান-বাংলা মৈত্রী সমিতির চেয়ারম্যান তোশুইওসি নারা (Tsuyoshi Nara) বলেন, "যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্ব রাজনীতির চাপে জাপান সরকারীভাবে তাদের সমর্থন জানাতে পারছিল না, তারপরও আমরা গোপনভাবে সরকারের কাছে সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম। যখন আমি বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য জাপানী কর্তপক্ষের কাছে মানবিক সাহায্য পাঠানোর আবেদন করলাম তখন আমাকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করতে বলা হয়েছিল। পরে যখন আমি তাদের প্রক্রিয়াটি দ্রুত করার কথা বললাম তখন তাঁরা এক সপ্তাহের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করল এবং বাংলাদেশে রিলিফ পাঠানো শুরু করল।[৬]

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

জাপান তার দক্ষিণ এশীয় নীতির আলোকে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং এই অঞ্চলে পরাশক্তির ভূমিকা ও সাম্প্রতিক বিশ্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি জাপানের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাই বাংলাদেশ-জাপান রাজনৈতিক সম্পর্ক পর্যালোচনার পূর্বে দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানী নীতি সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক) দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানী নীতি

জাপান দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র বিশেষ করে বাংলাদেশের কাছে কি প্রত্যাশা করে? জাপান বাংলাদেশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য সহায়তা করছে তা কি এশিয়ার অনুন্নত দেশ হিসেবে না কি এর পেছনে ভিন্ন কোন কারণ রয়েছে তাও বিশে-ষণ করে দেখা প্রয়োজন। জাপান মনে করে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অনেকগুলো পরিবর্তন এসেছে। প্রথমটি হচ্ছে অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়ত, সামরিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধির উলে-খযোগ্য অগ্রগতি এবং তৃতীয়ত, চীনা অর্থনীতির বিস্তৃতি। এই সমস্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জাপান নতুন কৌশল নিয়েছে, যার ভিত্তি হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ। এই জাতীয় স্বার্থের প্রথমটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়টি, মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা (Free Trade System) সমর্থন করা। তৃতীয়টি হচ্ছে, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষা করা। এই বিষয়গুলোর মধ্যে জাপান তথা এশিয়ার নিরাপত্তা বিষয়টি নিহিত রয়েছে বলে জাপানী নীতি নির্ধারকরা মনে করেন।[৭]

দক্ষিণ এশিয়ায় গত দুই দশক ছিল ভারত ও পাকিস্তানের গোপন অস্ত্রায়ন কর্মসূচি। আন্তর্জাতিক কোনো স্বীকৃতির প্রয়াস এতে ছিল না। দুই দেশই আন্তর্জাতিক চাপের মুখোমুখি হতে চায়নি। সেদিক থেকে গোপন অস্ত্রায়ন কর্মসূচি বজায় রাখার স্বার্থে যুদ্ধ পরিহার নিতান্তই অনিবার্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে আণবিক অস্ত্রায়ন ধারাকে ধরে রাখার স্বার্থে।[৮] বিহার প্রদেশের বুদ্ধগয়াতে ছয় বছর কঠোর সাধনা করে গৌতম বুদ্ধ 'অহিংসা পরম ধর্ম', 'জীব হত্যা মহা পাপ' এই দর্শন আবিস্কার করেছিলেন। কিন্তু শান্তি ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের

দেশ ভারতে ১১ মে ৯৮ সালে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমাতেই (যে দিনটিতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ, মৃত্যু তথা পরিনির্বাণ লাভ) ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি তিনটি এবং ১৩মে দুইটি মোট পাঁচটি পারমাণবিক বোমা রাজস্থানের পোখরানে সাফল্যজনকভাবে বিস্ফোরণের ঘোষণা দেন। অবশ্য ১৯৭৪ সালের ১৮ মে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমাতেই প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর সরকার একই জায়গায় পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই সময় পরীক্ষা সফল হওয়ার পরে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে সাংকেতিক কোডে সাংকেতিক প্রেরণ করা হয়েছিল, 'The Buddha is smiling'। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাকিস্তান ২৮মে ৯৮ সালে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশের চাসাই মরু এলাকায় ৫টি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। উভয় দেশের এই ঘটনায় জাপান তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং মঞ্জুরি সহায়তা বাতিল করে দেয়।[৯]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে জাপানের সম্পর্ক জাপানী নীতি নির্ধারকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৩০ কোটির অধিক লোকসংখ্যার দক্ষিণ এশিয়ার বাজার জাপানী ব্যবসায়ীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এই অঞ্চলে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক প্রচুর এবং বেতনের হারও খুব নিম্ন। সরকার বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দিচ্ছে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য নীতিমালা অনেক সহজ করেছে। কাজেই দক্ষিণ এশিয়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি জাপানী উদ্যোক্তাদের পছন্দের এলাকা হতে পারে। এলাকাকেন্দ্রীক শিল্প স্থানীয় চাহিদাও মেটাতে পারবে। স্থানীয়ভাবে জাপানী উদ্যোক্তারা কাঁচামালও ব্যবহার করতে পারবে। এই অঞ্চলে চীনা পণ্যের প্রসার জাপানীদের জন্য চিন্তার কারণ। সামরিক কৌশলগত দিক থেকেও জাপানী প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের কাছে দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্ব রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে চীনের সীমান্ত রয়েছে। এ বিষয়টিও জাপানী নীতি-নির্ধারকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। 'জাপান তার সংগৃহীত এনার্জির শতকরা ৫০ ভাগ পারস্য উপসাগর এলাকা থেকে সংগ্রহ করে যা ভারত মহাসাগরের পাশ দিয়ে জাপানে পৌছায়।'[১০] কাজেই দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা তার জন্য একান্তই প্রয়োজন।

সার্কের বিষয়ে জাপানের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৮৭ সালের আগস্টে, ঢাকায় প্রদত্ত এক ভাষণে জাপানের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুরানারী এ প্রসঙ্গে বলেন, 'জাপানী নীতির প্রধান স্তম্ভই হচ্ছে, সার্কের প্রতি অব্যাহত সমর্থন। এই সমর্থন কেবল অর্থনৈতিক নয় বরং আরো তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজনৈতিক বটে।'[১১] জাপান জাতীয় ও আঞ্চলিক ঐকমত্য এবং উদ্যোগ ও ঐকমত্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে। যদি আঞ্চলিক সহযোগিতা, অঞ্চল বহির্ভূত দেশগুলোর সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় তখন তা আরো গঠনমূলক হয়। জাপান আসিয়ানের মতো অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরামের সঙ্গে সার্কের কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের পরামর্শ দেয়। উল্লেখ্য আসিয়ানও জাপানী প্রভাব বলয়ভুক্ত অন্যতম একটি অঞ্চল। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক জোট গঠনের যে প্রবণতা তার প্রেক্ষাপটে সার্কের প্রতি জাপানের সমর্থন একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিককেই তুলে ধরে। প্রশান্ত মহাসাগর বেষ্টিত বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি ও ঋণদাতা দেশটির

পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার আশ্বাসের মূল্য অপরিসীম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে সার্কের যোগাযোগ সারা দক্ষিণ এশিয়া বিশেষত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে সাম্প্রতিক বিশ্বের জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষের ধারণা 'বিশ্ব মঙ্গোলীয়' বা 'বিশ্ব বৌদ্ধ পুনরুত্থান' (Pan-Mongolian or Pan Buddhist Revivalism) এর আওতায় এবং প্রকৃত অর্থে অদূর ভবিষ্যতে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলসমূহে স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখতেই জাপানের এই সচেতনতা।

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্কের শেকড় ঐতিহাসিকভাবে অনেক গভীরে। বৌদ্ধ মতবাদের জন্মস্থানের নিকটে বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভগবান বুদ্ধের বোধিলাভের সমভূমিটির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জাপানীদের কাছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে শ্রদ্ধার স্থান। ১৯৭৬ সালে জেনারেল ফুজিয়ারা কর্তৃক ব্রহ্মপুত্র তীরের সমৃদ্ধ পুণ্যভূমি সফর এরই নিদর্শন। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকে জাপান সমর্থন করে। এ বিষয়ে উভয় দেশের দৃষ্টিভঙ্গি এক। জাতিসংঘের বিভিন্ন শান্তিরক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়েছে জাপান। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে, 'সাবালক' হয়ে ওঠা জাপানের জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী আসনে জয়লাভ সেদেশের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যকেই তুলে ধরে। ভারত ও অস্ট্রেলিয়াকে অস্থায়ী আসন লাভের প্রতিযোগিতায় পিছনে ফেলে ১৯৯৬-র ২৩ অক্টোবর জাপান নির্বাচিত হয়। ১৯৯৭-র ১লা জানুয়ারী থেকে দু'বছরের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে জাপান নিজেদের বক্তব্য পেশ করে। স্থায়ী পাঁচটি দেশের মতো ভেটো দেবার চরম ক্ষমতা না থাকলেও জাতিসংঘের মতো সর্বোচ্চ বিশ্বসংস্থায় জাপান জাতিসংঘ সংস্কারের কথা বলেছে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে জাপান তৎপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় জোর লবিং চালাচ্ছে তারা। জাপান উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্ব হতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য পদ বৃদ্ধির পক্ষপাতী। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মনে করে জাতিসংঘকে আরো গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ হতে হবে। বাংলাদেশ জাপানীদের ধারণাকে সমর্থন করে। পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগের বাস্তব অভিজ্ঞতা জাপানের আছে। জাপান তার বিদেশনীতির তত্ত্বগত দিকের যে ব্যাখ্যা করেছে, তার প্রধান বিষয়বস্তুই হল গোটা বিশ্বকে পরমাণু অস্ত্রের বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা করা। বাংলাদেশ সিটিবিটিকে অনুমোদন করেছে। বাংলাদেশ সফরকালে জাপানী প্রধানমন্ত্রী মোরি বলেন, 'Bangladesh's ratificaition of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, and its energetic role as the prosper of the South Asian Association for Regional Cooperation.'[১২]

নিম্নে বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্কের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটি বিভিন্ন সরকারের সময়ের প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে:

ক) ১৯৭২-১৯৭৫

দক্ষিণ এশিয়ায় (বাংলাদেশসহ) সোভিয়েত কৌশল ছিল এ অঞ্চলে চীন ও আমেরিকার প্রভাব ক্ষুণ্ন করা। অন্যদিকে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ঠিক তার বিপরীত ছিল। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্টের দ্বন্দ্ব সারা বিশ্বকে প্রায় দুই

শিবিরের প্রভাব বলয়ে বিভক্ত করে ফেলেছিল। জাপান এ সময়ে বিশ্ব রাজনীতি থেকে দূরে থাকায় দক্ষিণ এশিয়ায় এ বিষয়ে নিজেদেরকে জড়াতে চায়নি। তাদের মনোনিবেশ ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে। কৌশলগত কারণে তাদের মনোযোগ অধিক পরিলক্ষিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখা কি হবে তা নিয়ে বিশ্ববাসীর তথা বাংলাদেশের জনগণের যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে 'সুইজারল্যান্ডের মত গড়ে তোলার, অঙ্গীকার করেন।[১৩] কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ব্যাপারে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ দুটি দেশের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যা যুক্তরাষ্ট্র বা চীন কেউ স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। তারা এ এলাকায় তাদের 'কর্তৃত্ব পরিত্যাগ' করতে রাজি ছিল না।[১৪] তবুও লক্ষণীয় ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে উঠে পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে। এই সময়ে দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটি হচ্ছে জাপানের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি এবং অন্যটি জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভে জাপানের সমর্থন।

পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় বন্দী থাকার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২। ঐদিনই জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাকেও ফুকুদা ঢাকায় জাপানের কনসাল জেনারেল মাসাতাদা হিজাকির (Masatada Hegaki) মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানায় জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাপান হচ্ছে ৩১তম দেশ যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ঐ একই দিন কিউবাও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।[১৫] একইসাথে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সাতো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টোকে জানায়, 'জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পাকিস্তানের প্রতি জাপানের নীতি অপরিবর্তিত থাকবে।'[১৬] মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার দুই মাসের মধ্যে ঐ স্বীকৃতি অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া ও তা থেকে জাপানকে আড়ালে রাখার বিষয়ে আলোকপাত করি তাহলে বিষয়টি পরিস্কার হবে। এই স্বাভাবিকিকরণ প্রক্রিয়ায় জাপানের আপত্তির কিছু ছিল না কিন্তু জাপান আশা করেছিল পূর্ব এশিয়ার ঘনিষ্ট মিত্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে বিষয়টি অবহিত করবে। বিষয়টি জাপানী নীতি-নির্ধারকদের হয়তো ভাবিয়ে তোলে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাপানের মত প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে তুলে ধরে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সে সুযোগকেই জাপানের সামনে তুলে ধরে। বিশ্বের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি আসে জাপানের কাছ থেকেই। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে ১০ নভেম্বর, ১৯৭৪। নিরাপত্তা পরিষদে জাপানসহ ১১টি দেশের প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের পক্ষে ভোট দেয়।

খ) ১৯৭৬-১৯৮১

১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ সময়

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন ধারায় প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ক্ষমতায় আসেন মোশতাক আহমদ। তিনি ভারত-সোভিয়েত অক্ষ থেকে বের হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে চাচ্ছিলেন। সৌদি আরব, চীন নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এ সব স্বীকৃতিতে সরকারের আগ্রহের ধরন থেকে এটা বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ ধীরে ধীরে ভারত-সোভিয়েত অক্ষ থেকে বের হয়ে আসছে।[১৭] অন্যদিকে জাপান সরকারের এ ঘটনায় নীরবতা পালন করে। তারা কোন মতামত ব্যক্ত করার চেয়ে নীরব থাকাকেই শ্রেয় মনে করে। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ৬ই নভেম্বর ক্ষমতায় আসেন বিচারপতি এ এস এম সায়েম এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে থাকেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। এ সময় ১৯৭৬ সালের মার্চে একটি জাপানি প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে ঢাকায় আসেন মি. তাকাশি হায়াকাওয়া (Takashi Hayakawa)। তিনি বলেন, "আগস্টের পরিবর্তনের পর এখন কোন রাজনৈতিক শূন্যতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।"[১৮] এই উক্তিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জাপান বাংলাদেশের অস্থিতিশীল পরিবেশকে মেনে নিয়েছিল এবং নতুন সরকারের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অভিপ্রায় নিয়েই তিনি এদেশে এসেছিলেন। ১৯৭৭ সালের ২১শে জুলাই জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর নতুন সরকারের সামনে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা দেখা দেয়, জাপান সরকার সেক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে শান্তি স্থিতিশীলতা রক্ষার প্রশ্নে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে। জাপান এই অঞ্চলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশের সঙ্গে জাপান পূর্বের ধারাবাহিকতায় পারস্পরিক সম্পর্ক বিকাশেই অধিকতর মনোযোগী ছিল। ১৯৭৭ সালের ১৭ই জুলাই জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ইচিরো হাতোয়ামা (Ichiro Hateyama) বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে কোন জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এটিই ছিল প্রথম সফর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জাপানের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও দু'জন পার্লামেন্ট সদস্যসহ মোট ২০ জন সদস্য। তিনি রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই অঞ্চলে শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে কোন অবস্থাতেই যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, এ বিষয়ে তাঁরা উভয়ই মত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নে জাপান শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে মনে করে। সাংবাদিকরা উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন বলতে কি বোঝায় জিজ্ঞাসা করলে মি. হাতোয়ামা উত্তরে জানান "আমরা মনে করি এশিয়ার শান্তি ও স্থিতিশীলতার সাথে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার সম্পর্ক রয়েছে।"[১৯] তিনি আরও বলেন, "উন্নয়ন কর্মসূচির দ্রুত ও সফল বাস্তবায়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা যে একান্ত অপরিহার্য তাতে দ্বিমতের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এশিয়ার আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর বাংলাদেশ সবসময় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। শান্তি, সম্প্রীতি, নিরাপত্তা ও অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণবাদী ও অধিপত্যবাদী তৎপরতা এবং অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বন্ধ করার বলিষ্ট আহ্বান জানিয়েছিল বাংলাদেশ। ফারাক্কা ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিরোধের বিষয়ে মি. হাতোয়ামা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলবেন বলে

জানান। মি. হাতোয়ামা বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বের সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়করণ নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের বেসরকারি খাতের উন্নয়নকে তিনি স্বাগত জানান।

পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৯৭৮ সালের ৬ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে টোকিও যান। সফরের পূর্বে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট এমন এক সময় জাপান সফরে যান, যখন জাপান পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ত্রিমুখী নীতি গ্রহণ করেছিল। জাপান একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল। জাপান তার এলাকায় কোন রকম উত্তেজনা পছন্দ করে না। তাঁরা মনে করেন শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি যে কোন উন্নতির সহায়ক।[২০] সফরকালে প্রেসিডেন্ট জিয়া ও প্রধানমন্ত্রী তাকেও ফুকুদা (Takeo Fukuda) পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রশ্নে বলেন, আজকের বিশ্ব-পরিস্থিতি পরস্পর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক সমাজে বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রাখা ও তার উন্নয়নে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। উভয়ই মনে করেন, বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার প্রয়োজনেই এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং এতদঞ্চলের সমৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের গঠনমূলক প্রচেষ্টায়, নিজ নিজ সরকারের সহযোগিতা প্রদানের সংকল্পের কথা বলেন। জাপানী প্রধানমন্ত্রী বলেন, "জাপান ও এশিয়ার অন্যান্য জাতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং প্রত্যেকেই এই অঞ্চলের শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের অংশীদার।" তিনি দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে ঐতিহ্যগত মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ব্যাপারে জাপান সরকারের সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিজ দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেন এবং জোট নিরপেক্ষ নীতিতে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন। সার্বভৌমত্ব, সমতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল দেশের সাথে তাঁর দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়নের সদিচ্ছার কথা প্রকাশ করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া ও প্রধানমন্ত্রী ফুকুদা মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়েও পর্যালোচনা করেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, 'নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ও ৩৩৮ নম্বর প্রস্তাব ত্বরিত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক প্যালেস্টাইনী জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার মেনে নেয়ার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায় ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।'[২১] দুই দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী বিশ্বশান্তি বজায় রাখা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়নে জাতিসংঘের পালিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উলে-খ করেন এবং জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে দুদেশের সরকারের মধ্যে অব্যাহত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সংস্থার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা ও আশা আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরার ব্যাপারে বাংলাদেশ যে কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এজন্য তাঁকে অভিনন্দিত করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতিসংঘের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত রাখার প্রশ্নে জাপানের দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসা করেন। নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির প্রশ্নে

উভয় পক্ষই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার জন্য মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি। প্রেসিডেন্ট জিয়া ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে শান্তির এলাকায় পরিণত করার জন্য জাতিসংঘ প্রস্তাব বাস্তবায়নে উপকূলীয় ও পশ্চাদভূমির সকল দেশের বৈঠকের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এই অঞ্চলে অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের সকল অংশে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা চালানো হলে তা হবে এই লক্ষ্যে একটি অগ্রণী পদক্ষেপ।[২২] তাঁরা উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব-আরোপ করেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্বশান্তি উন্নয়নের স্বার্থেই দু'পক্ষের মধ্যে বিবদমান সমস্যাগুলোর ত্বরিত সমাধানের অনিবার্যতার কথা উলে-খ করেন। এ প্রসঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাণিজ্য ও পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বাস্তব ও সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের বেলায় জাপান অন্যান্য দেশের সাথে আন্ত রিক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং ব্যবস্থাগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাবে। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট জিয়ার এই টোকিও সফরের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ ছিল, উভয় দেশের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠান। দুটি দেশের সম্পর্কোন্নয়নে এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে মত বিনিময় ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে প্রস্তাবিত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকগুলোতে। এছাড়া দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি যৌথ কমিশন গঠনেরও সুপারিশ করা হয়। বাংলাদেশ ও জাপান ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এতে বাংলাদেশ জয়ী হয়। দুই দেশের সম্পর্ক যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্য নির্বাচনের পূর্বে জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোস্তফা কামাল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের একটি পত্র জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. সোনোদার (Sonoda) কাছে হস্তান্তর করেন।[২৩] পত্রে বলা হয়, বাংলাদেশ জাপানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার করার জন্য কাজ করে যাবে এবং পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সহযোগিতা করবে। জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, নির্বাচনের ফলাফল দুটি দেশের মধ্যে সামান্যতম প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে না। এতে প্রতীয়মান হয়, বিষয়টি জাপান স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছিল এবং বাংলাদেশ সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করলেও বাংলাদেশ-জাপান রাজনৈতিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়নি। এছাড়া ভিয়েতনামী সেনাবাহিনী কর্তৃক কম্পুচিয়ায় এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর প্রবেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ও জাপানের অবস্থান এক ছিল।

গ) ১৯৮২-১৯৯০

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর ১৯৮১ সালের ৩১ মে ক্ষমতায় আসীন হন বিচারপতি আবদুস সাত্তার। এই সময়ে বাংলাদেশ সফরে আসেন জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির চেয়ারম্যান তাকাশি হায়াকাওয়া। তিনি নতুন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সুজুকির একটি বার্তা পৌছে দেন। তিনি মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বেগম

জিয়ার সাথে দেখা করেন। ধারণা করা যায়, জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বার্তাবাহী এই প্রতিনিধি বাংলাদেশে ঐ সময়ে অস্থিতিশীল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যই মূলত এখানে আসেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় আসীন হন ১৯৮৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর। তিনি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের গৃহীত নীতি অব্যাহত রাখেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদের সময়ে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে জাপানের সমর্থন আদায়, সার্ক ও উপসাগরীয় সংকটের বিষয়গুলো প্রাধান্য লাভ করেছিল। ১৯৮৮ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে বাংলাদেশের পক্ষে জাপানের সমর্থন আদায়ের জন্য জাপান গমন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী। জাপানী প্রধানমন্ত্রী মি. ইয়ামুহিরো নাকাসোন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানান, জাপান বাংলাদেশের প্রার্থীকে সমর্থন দিবে। অবশ্য সেবার বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভে ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯৮৭ সালের ১৩ই আগষ্ট তিন দিনের সরকারি সফরে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদাশী কুরানারী (Tadashi Kuranari) বাংলাদেশে আসেন। তিনি রাষ্ট্রপতি এইচ.এম. এরশাদ, উপ-রাষ্ট্রপতি জনাব নুরুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। আন্তর্জাতিক ইন্সটিটিউট অব স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ আয়োজিত এক সেমিনারেও তিনি বক্তব্য রাখেন।[২৪] জাপান সাত জাতি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতিকে (সার্ক) শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল।[২৫] বাংলাদেশ সফরের পূর্বে জাপানী প্রতিনিধিদল ভারত সফর করেছিলেন। সেখানে জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদাশী কুরানারী ভারতের পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নটবর সিং এর সাথে আলোচনাকালে সার্ককে সহযোগিতা করার কথা বলেন এবং জাপান সার্ককে খুবই গুরুত্ব দেয় এবং সার্কের অর্থনৈতিক ও অসামরিক তৎপরতায় সহযোগিতা দিতে আগ্রহী বলে জানানো হয়। দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে জাপানের সাহায্য অব্যাহত থাকবে এবং সাহায্যের প্রস্তাবটি গৃহীত হবার আগে সার্কভুক্ত সাতটি দেশে তা নিয়ে আলোচনা হবে বলেও মুখপাত্র উল্লেখ করেন।[২৬] উল্লেখ্য সার্ক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলো হচ্ছে আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র, টেলিযোগাযোগ ও পরিবহন গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন এবং একটি অভিন্ন সম্প্রচার কর্মসূচি বাস্তবায়ন। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত 'দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক, শীর্ষক সেমিনারে জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তাঁর দেশ দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নয়নের জন্য অব্যাহত সহযোগিতা দেবে। তবে এটা নির্ভর করছে সার্কের সফলতার উপর। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা, সমঝোতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংক্রান্ত সহযোগিতা বিস্তার, এই তিনটি নীতি বা পিলারের মাধ্যমে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবে বলে তিনি উলে-খ করেন।[২৭] দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে জাপানের বর্তমান সম্পর্ক আরও নিবিড় ও প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজন বলে উলে-খ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সার্কের চেতনা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলাপকালে দ্বিপাক্ষিক বিষয় ছাড়াও ইরান-ইরাক যুদ্ধ, আফগানিস্তান, কম্পুচিয়া ইস্যু আলোচনায় স্থান পায়।

১৯৯০ সালের ১লা মে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোশিকি কাইফু ও মিসেস শাচিও কাইফু

দু'দিনের সফরে ঢাকা আসেন।[২৮] পাঁচটি দেশ সফর কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশে আসেন। কোন জাপানী প্রধানমন্ত্রীর এটিই প্রথম বাংলাদেশ সফর। বাংলাদেশ সরকারের সাথে জাপানী প্রধানমন্ত্রীর আলোচনায় যমুনা সেতু এবং বিনিয়োগ প্রসঙ্গ স্থান পায়। ১৯৯০ সালের ১১ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি এরশাদ তৃতীয় বার টোকিও সফর করেন নতুন সম্রাট আকিহিতোর সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য। এতে আরও ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ, প্রধানমন্ত্রী কাইফুর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রী কাইফু উপসাগর সংকট প্রশ্নে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, সৌদি আরবে বাংলাদেশ সৈন্য প্রেরণে সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশের নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ও জাপানের অবস্থান এক। রাষ্ট্রপতি এরশাদ উপসাগর সংকটের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে বিশাল প্রভাব পড়েছে এবং এই পরিস্থিতি মোকাবেলা গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জাপানী প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রপতি ও বেগম রওশন এরশাদের সম্মানে আয়োজিত যৌথ সম্বর্ধনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন যে, 'উপসাগর, কম্পুচিয়া ও আফগানিস্তান পরিস্থিতি প্রশ্নে উভয় দেশের রয়েছে সমদৃষ্টিভঙ্গি এবং এটি স্বীকৃত নীতিমালায় প্রতিষ্ঠিত। ইরাক ও কুয়েতে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করার জন্য তিনি জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রয়াত তাকাশি হায়াকাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁকে জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির জনক বলে অভিহিত করেন।[২৯]

ঘ) ১৯৯১-১৯৯৫

১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদের পতন ঘটে। বিচারপতি (অব:) সাহাবুদ্দিন আহমেদ -এর নেতৃত্বে নতুন নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরুর ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে জাপানের গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এই পটভূমিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য হিরোইচি ফুকুদার নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এক জাপানী প্রতিনিধিদল ১৯৯১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আসেন। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে বলা হয় 'এশিয়ার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদারে সহযোগিতা করা জাপানের প্রতিষ্ঠিত নীতি।[৩০] প্রতিনিধিদল ঢাকা ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ফুকুদা নির্বাচন-পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠ, শান্তিপূর্ণ ও পক্ষপাতহীনভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্র উত্তরণের এই প্রক্রিয়ায় তারা আনন্দিত ও আশাবাদী বলে মন্তব্য করেন। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) ক্ষমতায় আসে। নতুন সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ধারণা তার নির্বাচনী ইশতেহার থেকে পাওয়া যায়। নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়, জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ এবং সকল রাষ্ট্রের সাথে সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে সহযোগিতামূলক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সমতাভিত্তিক সুসম্পর্ক ও মুসলিম দেশসমূহের

সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন অব্যাহতভাবে অনুসরণ করা হবে। আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সক্রিয় নীতি অব্যাহত রাখা হবে। বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা বিধান এবং জাতিসংঘের কাঠামোগত সংস্কার সাধনের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। বিশ্বশান্তি রক্ষায় অবিচলভাবে কাজ করা হবে। জাতিসংঘের আহ্বানে শান্তিরক্ষার কাজে বিশ্বের যে কোন স্থানে প্রতিরক্ষা বাহিনী পাঠানো হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কূটনীতির উপর জোর দেয়া এবং এই সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন নদ-নদীর পানি বণ্টন নিয়ে সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। বিষয়টি বাংলাদেশ ও জাপানের রাজনৈতিক আলোচনায় উঠে আসে। বেগম জিয়া তাঁর জাপান সফরের সময় জানান, গঙ্গা ও তিস্তার পানি প্রবাহের ন্যায্য হিস্যা ভারতের কাছ থেকে আদায় করতে বাংলাদেশ গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশের ২৩০টি নদ-নদীর মধ্যে ৫৪টি বড় নদী ভারত থেকে এসেছে। 'বেগম জিয়ার সময় গঙ্গার পানি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য কোন চুক্তি না থাকায় ভারত এসব নদী থেকে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে। ফলে, দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ দেখা দেয় এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। গঙ্গার উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পর ভারত একে একে ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও বরাকসহ অভিন্ন নদীগুলোর প্রায় সবগুলোর উপর বাঁধ নির্মাণ করে। এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য - এক কথায় বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।[৩১] বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া আশা প্রকাশ করে বলেন, জাপানের মত বন্ধু দেশগুলো পানির ব্যাপারে অমানবিক নীতি পরিত্যাগ করতে ভারতকে রাজি করানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে এবং তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জাপান সরকার ও জনগণের উদার সহযোগিতা ও সমর্থনের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।[৩২] নিরাপত্তা পরিষদে জাপানের স্থায়ী সদস্য পদ লাভের প্রচেষ্টার প্রতি বেগম জিয়া সরাসরি সমর্থন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে ১৫ করা হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা আগের মতোই রয়ে গিয়েছে পাঁচ। এই পাঁচটি দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও চীন। কিন্তু এখন পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে একক পরাশক্তির অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে অনেক দেশই এই ব্যবস্থায় খুশী নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত অক্ষশক্তি জাপান ও জার্মানী এখন নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে অনেকটা অপরাজেয় অর্থনৈতিক শক্তিরূপে। তাই তারাও ভেটো ক্ষমতাসহ স্থায়ী সদস্য পদের দাবিদার। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিতে ৩৭টি দেশের পক্ষ হতে উত্থাপিত ভারতীয় প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় সাধারণ পরিষদে। ভারতের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৫ সালে) বলেছে, 'কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হলেই ভারতের দাবি বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যদিকে পাকিস্তানী প্রতিনিধি জনাব জামশেদ মার্কার (১৯৯৫ সালে) বলেন, জাপান ও ভারত ছাড়া আগ্রহী অন্যান্য দেশের বিষয়ও বিবেচনায় নেয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার নাম উল্লেখ করেন।[৩৩]

ঙ) ১৯৯৬-২০০১

১৯৯৬ সালের ১২ই জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য জাপানের সাবেক প্রতিমন্ত্রী এবং তৎকালীন সংসদ সদস্য শিন শাকুরাইয়ের (Shin Sakurai) নেতৃত্বে নয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসেন। নির্বাচন-পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে 'ঢাকা ও কুমিল-ার দুটি নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শন করে আমরা নিশ্চিত হয়েছি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয়েছে' বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৩৪] ১৯৯৬ সালের এই নির্বাচনে দীর্ঘ ২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা লাভ করে। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন তাঁর নেতৃত্বে ঐকমত্যের সরকার গঠিত হয়েছিল। শেখ হাসিনার সরকারের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় এই দলগুলোর কোনো প্রভাব ছিল না। আওয়ামী লীগ পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে নির্বাচনী ইশতেহারে[৩৫] বলে, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা সুরক্ষিত রাখা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই হবে পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য। জাতিসংঘ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ, মুসলিম রাষ্ট্র সম্মেলন (ওআইসি) এবং সার্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থবহ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আওয়ামী লীগ সচেষ্ট থাকবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা ও সুসম্পর্কের ভিত্তিতে আঞ্চলিক সহযোগিতার কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। আওয়ামী লীগ সার্ক-এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করবে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সার্ক এর কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীচুক্তি নবায়ন না করা, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে ফারাক্কা সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টনের প্রশ্নেও বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতকরণ করা হবে।[৩৬] ভারতের সাথে গঙ্গার পানি চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের বিষয়গুলো আলোচানয় প্রাধান্য পায়। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর এ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টন সংক্রান্ত ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তি হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ৪০ হাজার ও সর্বনিম্ন ৩৫ হাজার কিউসেক পানি পাবে। ফলে দীর্ঘদিনের চুক্তিহীনতার অবসান ঘটে।[৩৭] ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসান ঘটে।[৩৮] প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সাথে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের বিষয়ে জাপানী প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। উলে-খ্য, ১৯৯৮ সালে ভারত (১১-১৩ মে) দ্বিতীয় বারের মতো (প্রথমবার ১৯৭৪ সালে) ভূগর্ভে ৫টি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাকিস্তান (২৮মে, ১৯৯৮) সমসংখ্যক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে এই উপমহাদেশে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। এই চুক্তির মূলকথা হচ্ছে কোনো সদস্য রাষ্ট্রই কোন রকম পারমাণবিক পরীক্ষা, বিস্ফোরণ কিংবা অন্য কোন প্রকার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না এবং তার এলাকাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য যে কোন স্থানেও তা বন্ধ করতে হবে। ভারত ও পাকিস্তান কেউ এই চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। স্বাক্ষর না করার পেছনে ভারতীয়দের যুক্তি হচ্ছে, চুক্তি করে বিশ্ব থেকে পারমাণবিক অস্ত্র

প্রতিযোগিতা রোধ করা যাবে না। অন্যদিকে পাকিস্তানের যুক্তি হচ্ছে, ভারত যেহেতু NPT বা CTBT চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি সেহেতু পাকিস্তান তার নিরাপত্তার প্রশ্নে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত ত্রি-দেশীয় বাণিজ্য সম্মেলনের মত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। 'জানুয়ারী ১৫,' ৯৮-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম ত্রিদেশীয় শীর্ষ সম্মেলন। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের তিন প্রধানমন্ত্রী ও শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে এ দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ প্রসার এবং সর্বোপরি আন্তঃআঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারকরণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন।[৩৯] জাপানের পক্ষ থেকে জানানো হয় জাপান সার্কের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে এবং সার্ককে আরো কার্যকর করার জন্য জাপান-সার্ক বিশেষ ফান্ড গঠনের কথা জাপানী প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী মোরি জাতিসংঘের সংস্কারের কথা তুলে ধরেন এবং আশা প্রকাশ করেন জাতিসংঘের মিলেনিয়াম অধিবেশনে জাপান এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরবে। তিনি আরো বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতিসংঘ আরো কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে পারবে। তিনি উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ থেকে স্থায়ী সদস্য নেয়ার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন, মিলেনিয়াম অধিবেশনের বক্তব্য তৈরী করার সময় তিনি এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন। প্রধানমন্ত্রী শান্তির জন্য এশিয়ান পার্লামেন্ট এসোসিয়েশন-এ (Association of Asian Parliaments for Peace-AAPP) জাপানের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। জাপানী প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি উভয় কক্ষের সদস্যদের জানাবেন বলেও উলে-খ করেন।[৪০]

চ) ২০০১-২০০২

২০০১ সালের ১লা অক্টোবর নির্বাচনে চারদলীয় ঐক্যজোটের সরকার ক্ষমতায় আসে। বি.এন.পি-র সাথে ক্ষমতায় আসে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, জাতীয় পার্টির (নাজিউর) একাংশ। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বি.এন.পি তার পূর্বের ধারা (৯১-৯৬) অব্যাহত রাখে। সরকার পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড: আব্দুল মঈন খান ২০০১ সালের নভেম্বরে টোকিও সফর করেন। তিনি বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও জাপানের রেডিও চ্যানেল এন.এইচ.কে (N.H.K) এর মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। তথ্যমন্ত্রী শিক্ষামূলক টিভি অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ রেডিওর এফ. এম (FM) কার্যক্ষমতা বাড়ানোসহ অন্যান্য বিষয়ে এন.এইচ.কে'র সহযোগিতা চান। ড: খান এন.এইচ.কে'র বাংলা ষ্টুডিও ও অন্যান্য সুবিধাদি ঘুরে দেখেন। তথ্যমন্ত্রী জাপানে, উন্নয়ন সহযোগিতা ও পার্টনারশীপ' বিষয়ে আফ্রো-এশিয়ান পার্লামেন্টারিয়ান মিটিং ও এশিয়া-প্যাসিফিকে দুর্নীতি বিষয়ক তৃতীয় বার্ষিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তথ্যমন্ত্রী দ্বিবার্ষিক সহযোগিতা বিষয়ে জাপানের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের স্পীকার তামিসুকে ওয়াটানুকির (Tamisuke Watanuki) সাথে আলোচনা করেছিলেন। স্পীকার, বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য অভিনন্দিত করেন। ড: মঈন খান ২০০২ সালে দুই দেশের সম্পর্কের ত্রিশবছর

পূর্তি জাঁকজমকভাবে পালনের জন্য প্রস্তুতির বিষয় অবহিত করেন। তিনি দুই দেশের পার্লামেন্টারিয়ানদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দুই দেশের মধ্যে গঠিত পার্লামেন্টারী ফ্রেন্ডশীপ এসোসিয়েশন আরো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তার সহযোগিতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।[৪১] ২০০২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও জাপান কূটনৈতিক সম্পর্কের ত্রিশ বছর পূর্তি হয়। বাংলাদেশে জাপানী দূতাবাস 'Japan Month' নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দুই দেশের পক্ষ থেকেই আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্কের ত্রিশ বছর উদযাপিত হয়।

উপসংহার

বাংলাদেশ-জাপান কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের বিকাশমান ধারা লক্ষণীয়। বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন এই অব্যহত ধারাকে ব্যহত করেনি বরং দুই দেশের সরকারি পর্যায়ে প্রতিনিধি বিনিময়, শুভেচ্ছা, বার্তা বিনিময়, মত বিনিময়, সাহায্য ও সমর্থনের বিষয়াদি দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক সম্পর্কের গুরুত্বকেই তুলে ধরেছে। জাতীয় ও পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়টি দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের মূল বিষয় হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপর্যুপরি পালাবদল ঘটলেও জাপানের সাথে আমাদের সম্পর্ককে তা প্রভাবিত করতে পারেনি। বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দানের পর থেকেই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপান সক্রিয় সহযোগিতা দিতে শুরু করে এবং সেই পথ ধরেই এই অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টি পরবর্তী সময়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়।[৪২] বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা নিরস্ত্রীকরণসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যু, যেমন, ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, কম্পুচিয়া, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে অংশগ্রহণ, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার ইত্যাদিতে অভিন্ন অবস্থান দুটি দেশকে আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে এবং স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্নে বাংলাদেশ-জাপান রাজনৈতিক সম্পর্ক ক্রম বিকাশমান। তবে, বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে গ্রহীতা-দাতা সম্পর্কে পরিণত হওয়ায় ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ইতিবাচক প্রাপ্তি হতে বাংলাদেশ অনেকাংশে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুসমূহ অর্থনৈতিক বিষয়ের পিছনে পড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে তাই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে, অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর অধিক মনোযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াই জাপান বিশ্বে আজকের এই অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে জাপানীদের একাগ্রতা ও অভিজ্ঞতা বাংলাদেশকে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা বিষয়ে জাপানীদের মনে যে শঙ্কা বিরাজমান, তা কাটানোর দায়িত্বও বাংলাদেশকেই নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. Padel Ford, et, al, the Dynamics of International Politics, New York, Mqcmillan Publication Co. 1976, p.120

২. F.S Northedge 'The Nature of Foreign Policy' in The Foreign Policy of the Powers, London, Faber and Faber, 1962, p.16.

৩. আজাদ, ১৭ অক্টোবর ১৯৭৩৫.

৪. মনজুরুল হক, বাংলাদেশ-জাপান মৈত্রীর সম্পর্কের তিন দশক, প্রথম আলো, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০০২।

৫. আনোয়ারুল করিমের সাথে সুকুমার বিশ্বাসের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, সংগৃহীত হয়েছে, Sukumar Biswas, Japan and the Emergence of Bangladesh, Agamee Prakashani, Dhaka, February 1998, p.243.

৬. অধ্যাপক নারার সাথে সুকুমার বিশ্বাসের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, সংগৃহীত হয়েছে Sukumar Biswas opcit, p. 244

৭. Basic Strategies for Japan's Foreign Polcy in the 21st Century New Era, New Vision, New Ddiplomacy Task Force on Foreign Relations for the Prime Minister, Executive Summary (unofficial translation), November 28, 2002 p.1. http// : w.w.w.kantei.go.jp/foreign policy.

৮.এম শহীদুজ্জামান পারমাণবিক অস্ত্রায়ন ও দক্ষিণ এশিয়া ঃ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১০ জুলাই ১৯৯৮।

৯. 'ভারতের আরো দুটি পারমাণবিক পরীক্ষা অবরোধ আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র', ভোরের কাগজ, ১৪ মে, ১৯৯৮।

১০. Abul Kalam, Japan and South Asia, Subsystemic Linkages and Developing Relationships, University Press Limited, 1996, p.95.

১১. দৈনিক ইত্তেফাক, ১মে, ১৯৯০।

১২. http//:w.w.w.mofa.go.jp.

১৩. The Bangladesh Observer, Dhaka, 14 Jan. 1972.

১৪. G. W. Choudhury "the Emergence of Bangladesh and the South Asian Triangle" in the Year Book of the World Affairs, Praeger, New York 1973, p.62.

১৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।

১৬. Mainichi Day News, 11 February, 1972, Quoted in Sukumar Biswas, op cit, 250

১৭. Talukder Maniruzzaman, "Bangladesh in 1975 : Fall of Mujib Regime and its Aftermath", Asian Survery, February, 1976 p.128.

১৮. The Bangladesh Times 18.03.76.

১৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮.০৭.৭৭।

২০. দেখুন Basic Facts : About the United Nations, Department of Public Information, United Nations, New York, 1998, pp.96-97. The Security Council by Resolution 242 of 22 November 1967, defined principles for a just and lasting peace in the Middle East. These are:1) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict.2) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every state in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries, free from threats or acts of force. The resolution also affirmed or acts of force. The resolution also affirmed the need to settle the refugee problem. The Security Council adapted Resolution 338 of 22 October, 1973 which reaffirms the principles of Resolution 242 and calls for negotiations aimed at a just and durable peace.

২১. দৈনিক বাংলা, ০৯.০৪.৭৮।

২২. The Bangladesh Observer, 30.11.1978.

২৩. The Bangladesh Observer, 3 September, 1979.

২৪. দৈনিক বাংলা, ১৪.০৮.৮৭।

২৫. বিস্তারিত দেখুন : আনু মাহমুদ, সার্ক ঃ এ্যাপেক ঃ ডি-৮ ঃ ইকো-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ফোরাম, ঐতিহ্য, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ.:১১। উলে-খ্য, '১৯৮৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ভুটান) নিয়ে গঠিত হয়েছিলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক (SAARC) সংস্থা। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৮৫ সালে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া হচ্ছে এ সংস্থার প্রধান লক্ষ্য।

২৬. দৈনিক সংবাদ, ১৩.৮.৮৭।

২৭. দৈনিক বাংলা, ১৫.৮.৮৭।

২৮. সাপ্তাহিক রোববার, ৬ মে, ৯০।

২৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ১২.১১.৯০।

৩০. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭.০২.৯১।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ:৩৯।

৩২. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৫ এপ্রিল, ৯৪ ।

৩৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ০১.০৩.৯৫ ।

৩৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫.০৬.৯৬ ।

৩৫. পাক্ষিক চিন্তা, সংখ্যা ১৮-১৯, ১৫ জুন, ১৯৯৬ ।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ:৩৬ ।

৩৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩.১২.৯৬ ।

৩৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ০৩.১২.৯৭ ।

৩৯. আনু মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৪ ।

৪০. http//:w.w.w.mofa.go.jp.com

৪১. The Daily Star, ০২.১২.২০০১ ।

৪২. মনজুরুল হক, "বাংলাদেশ-জাপান; মৈত্রী সম্পর্কের তিন দশক", প্রথম আলো, ১০.০২.২০০২ ।